বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬৩

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদপট :
বিনয় সরকার

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র দাশকে
যাঁর রম্য লেখনী অনেক পথের ব্যবধান
ও অপরিচয় ছিন্ন করেছে।

কলিকাতা
১৫ ফাল্গুন, ১৩৬৩

এই লেখকের বই

উপন্যাস ঃ এক বিহঙ্গী (৩য় সং)॥ সৈনিক (৭ম সং)॥ ওগো ব
সুন্দরী (৪র্থ সং)॥ বকুল (৩য় সং)॥ নবীন যাত্রা (৩য় সং)
জলজঙ্গল (৩য় সং)॥ শত্রুপক্ষের মেয়ে (৪র্থ সং)
যুগান্তর (২য় সং)॥ ভুলি নাই (২৬শ সং)॥ বাঁশের কে
(৪র্থ সং)॥ আগস্ট, ১৯৪২ (৩য় সং)॥ সবুজ চি
(২য় সং)॥ বৃষ্টি! বৃষ্টি!

গল্পগ্রন্থ ঃ মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং)॥ বনমর্মর (৪র্থ সং)॥ উ
(৩য় সং)॥ কাচের আকাশ (২য় সং)॥ দেবী কিশোরী
(৩য় সং)॥ খদ্যোত (২য় সং)॥ কুঙ্কুম (২য় সং)
কিংশুক॥ পৃথিবী কাদের? (৪র্থ সং)॥ নরবাঁধ (৪র্থ সং)
দিল্লি অনেক দূর (২য় সং)॥ দুঃখ-নিশার শেষে (৩য় সং)
একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং)॥

নাটক ঃ প্লাবন (৪র্থ সং)॥ নূতন প্রভাত (৫ম সং)॥ বিপর্যয়
রাখিবন্ধন (২য় সং)॥ বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং॥ শেষ লগ্ন॥

ভ্রমণ ঃ চীন দেখে এলাম ১ম পর্ব (৭ম সং)॥ দ্বিতীয় পর্ব (৪র্থ সং)
পথ চলি॥

নানা বরণ গাভী রে তার একই বরণ দুধ।
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত॥

(গাজির গীত)

নিবেদন

সদা সত্যকথা বলিবে—মহাজনের নীতিবাক্য এইরূপ বটে, কিন্তু এ বইয়ে ষোল আনা তা মানতে পারি নি। যৎকিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। নামেরও কিছু হেরফের আছে, আর রঙ ফলানো আছে জায়গায় জায়গায়। সেগুলো মিথ্যার হিসাবে যদি ধরেন, খাদের পরিমাণ আরও কিছু বাড়বে। তবু কিন্তু মোটের উপরে জলমিশ্রিত দুগ্ধ—দুগ্ধমিশ্রিত জল নয়।

(১)

উঃ, কত পথ চলেছি জীবনে—ভাবতে অবাক লাগে। ডাঙার পথ, জলের পথ, আর হালফিল এই হয়েছে—আকাশ-পথ। বিল-বাঁধ জঙ্গল-জাঙাল পাহাড়-প্রান্তর কত হেঁটেছি! হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। কাঁটা ফুটেছে, জোঁকে খেয়েছে, শামুকে পা কেটে চৌচির হয়েছে। ধূলিধূসর পথে সূর্য-দহনে রক্তমুখ হয়ে ছুটেছি কখনো—বর্ষায় ধারাস্নান করে ছুটেছি, খাল-পারের সময় পা পিছলে স্রোতের মুখেও পড়ে গেছি। পায়ে হাঁটতে হলে জুতো পরে হাঁটি ইদানীং—ভয় হয়ে গেছে, পায়ের তলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে হাঁটু অবধি না পৌঁছে যায়।

সেকালে মনোভাব ছিল আলাদা। ভাল করে তাকিয়ে দেখেছি কি ছাই পথের দিকে? পথ শেষ হয়ে যে জায়গায় পৌঁছব, সেইটাই রইত সমস্ত চোখ ও মন জুড়ে। কতক্ষণে চলার শেষ—তার জন্য ব্যাকুলতা।

তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যস্থল নিতান্ত গৌণ হয়ে দাঁড়াল। পথই আসল। গ্রামে গ্রামে বাউল-ফকিরের মতো ঘুরেছি চলার আনন্দে। কত সমস্ত মানুষজন ঘরবাড়ি, কত রকম সুখ-দুঃখ আশা-আশ্বাস! আলাপনে ও বিশ্রামে সময় বয়ে যায়, পথ এগোয় না। চারিদিকে উচ্ছলা ধরণী নব নব রূপ মেলে ধরেছে—কাকে ফেলে কাকে দেখি, তাড়াতাড়ি এগোব কি করে?

আয়ুর বালি ঝুরঝুর করে ঝরে গেল, বাকি আর কতটুকুই বা! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছি—কী করলাম, সবই তো প্রায় অজানা রয়ে গেল! দেহযন্ত্র বিস্তর খেটেছে—এর উপরে আর

মেয়াদ বাড়ানোর আবদার চলে না। ক্ষয়িত কলকব্জায় তালিতুলি মেরে দম দিয়ে দিয়ে চালানো বিরক্তিকর। এক জীবনে কুলায় না সত্যি, অনেক জীবন চাই। এবার যতদূর যা হল, ভালই— আবার নতুন জন্ম পাই যেন। অদেখা যত কিছু রইল, আবার দেখতে শুরু করব সেই নবীন অধ্যায়ে। এ ছাড়া সান্ত্বনা কোথায়? যদি কেউ শক্তিধর থাক মাথার উপরে, আমায় আবার জন্ম দিও— এই দরবার রইল।

যশোর জেলায় ঘর। যশোর থেকে কেশবপুর বিশ মাইল। বাপ-ঠাকুর্দার আমলে ঐটকু পথ লোকে পায়ে হেঁটেই যেত। শুধু স্ত্রীলোক, রুগ্ন ও অসমর্থের জন্য গরুর গাড়ি। তারপর ঘোড়ার গাড়ি এলো। ছোটবেলা আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চলাচল করতাম।

সাধারণ মাপের পালকি-গাড়ি—সিট ন' জনার। চারজন ভিতরে, চারজন ছাতে এবং একজন কোচবাক্সে কোচোয়ানের পাশে। পুজোর সময়টা অথবা চীনাটোলার মেলা লাগলে চড়ন্দারের ভিড় বাড়ত, তখন আরও চারজন বাড়তি নিয়ে নিত—দু-জন পিছনে সহিসের জায়গায়, আর দু-জন দু-দিককার পাদানিতে। পুরো ভাড়া দেবেন তো বটেই, সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতে হবে। যাওয়া না-যাওয়া আপনার ইচ্ছা, বুঝে দেখুন সেটা।

কলকাতা থেকে বাড়ি যাচ্ছি। টিকিট করে এসে নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছি যশোরের কোন উকিল-মোক্তারের বাসায়, উঠানের ধারে বিউগিল বেজে উঠল। মাদারবক্সের মেলগাড়ি। তাড়াতাড়ি উঠে জামা-টামা পরে গাড়িতে চড়ে বসলাম। ভেঁপু বাজাতে বাজাতে গাড়ি আর এক রাস্তায় চলল। প্যাসেঞ্জার কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে শহরময়। অবশেষে কেশবপুরের রাস্তায় উঠল। রাত ঝিমঝিম করছে। পথের দু-পাশে

ঘন জঙ্গল। কেউ ডাকছে কোনদিকে, কেঁদো-বাঘের উৎপাত। মাদারবক্সের মেলগাড়ি দৃকপাত করে না, [illegible]ভোভয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে যায়। রাজার-হাট ডাকঘ[illegible] সামনে গিয়ে একটানা বাজায় অনেকক্ষণ ধরে; সাড়া মে[illegible] না। তখন মুখে চেঁচাচ্ছে, ও পোস্টমাস্টার বাবু, ওঠো—ডাক এসেছে। শেষটা নেমে গিয়ে দুয়োর ঝাঁকায়। টেমি জ্বেলে গায়ে কম্বল জড়িয়ে পোস্ট-মাস্টার ওখানকার ডাকের ব্যাগ হাতে বাইরে এলেন, আর একটা নিয়ে নিলেন গাড়ি থেকে।—উঃ, কী শীতটা পড়ে গেল হঠাৎ। খবর নিও তো মাদার, কইয়ের নৌকো এসেছে কিনা কেশবপুরে। আমার জন্যে আধ কুড়ি কই নিয়ে এসো—এলে দাম দেবো।

তারপরে মোটর এলো লাইনে—মোটরবাস। গোড়ায় একখানা। মাদার বিন্দুমাত্র দমে নি। বলে, আমাদের এলাকায় মোটর চালাবে! রাস্তা নয়, চষা ক্ষেত—তার উপরে ঐ হ্যাকড়া মোটর! ও মোটর ডাল হয়ে যাবে দেখো (মোটরের তুলনা হল মটর-কলাইর সঙ্গে—আমাদের গ্রাম্য রসিকতা)।

একা মাদারবক্সেরই চারখানা গাড়ি। কার্তিক পালের দু-খানা। আরও সব আছে। সাকুল্যে দশ-বারো খানার মতো। মাদারই মাতব্বর, সকলের হয়ে কথা বলে। বলে, মোটরে বুঝে-সমঝে উঠো কিন্তু মশায়রা। যে একবার উঠেছে, সে কিন্তু চলে গেল ঐ দলে। তারপরে আর মাদারের গাড়িতে ঠাঁই হবে না। গোলমালে পড়লে মাদার কিছু জানে না।

না মাদার, আমরা আছি আর তুমি আছ। আমরা মোটরের দলে নই। তোমার ঘোড়া না চললে চাবুক আছে—যাবে কোথায়? আর সেদিন ওদের মোটর বিগড়েছিল—দু-দিন ঠায় সতীঘাটায় বসে; তারপরে কোম্পানি থেকে সাহেব এসে মেরামত করে দিয়ে গেল।

তবু কিন্তু বাসে ভিড় করে মানুষ। কপালে থাকলে, অর্থাৎ পথে কোনরকম বিপত্তি না ঘটলে, আড়াই ঘণ্টায় কেশবপুর নামিয়ে দেবে। আর ঘোড়ার গাড়িতে সেখানে ছ-সাত ঘণ্টা। চৌরাস্তায় বাস এনে রেখেছে। টিকিটঘর সামনে। নোটিশ-বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'কেশবপুরের মোটর, সময় ৪টা।' টিকিটঘরে ঘড়ি নেই। এ অঞ্চলের রীতিও নয় ঘড়ি ধরে চলাচল করা। প্যাসেঞ্জাররা গাড়িতে চেপে বসেছে। গরমে আইঢাই করছে, দমবন্ধ হয়ে যাবার গতিক। জায়গা ছেড়ে তবু বাইরে আসার জো নেই। সারা পথ নির্ঘাৎ তা হলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। এবং খুব সম্ভব গাড়ির ভিতরেও নয়। পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, ছাড়ো, ছাড়ো—ও ড্রাইভার মশায়, কখন ছাড়বে ?

ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর চায়ের দোকানের বাইরে টিনের চেয়ার টেনে এনে চা খাচ্ছে, আর খুব হাসাহাসি করছে কি-একটা রসের কথা নিয়ে। একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করে, চারটের গাড়ি চলে গেছে ?

ড্রাইভার এসব তুচ্ছ কথার জবাব দেয় না। কণ্ডাক্টর নোটিশ-বোর্ড দেখিয়ে দেয়, ঐ তো—

ক'টায় ছাড়বে ?

ছাড়বে সময় হলে। এখন যদি হয়, এখনই।

সন্ধ্যে হয়ে গেল যে !

রাত দুপুরও হয়ে যায় এক-একদিন—

আমাদের কপাল ভাল, সেদিন অত দূর আর গেল না। আদালত-ফেরত এক গাদা লোক এসে পড়ল। খুনের মামলার সাক্ষি। যতদূর পারে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল কণ্ডাক্টর। আর সকলকে বলে দেয়, পুলের ধারে গিয়ে দাঁড়াওগে যাও—। বাস থানার সামনে দিয়ে যায়। ষোল-আনা প্যাসেঞ্জার থানাওয়ালাদের

দেখাবে না—বেশি বোঝাইয়ের চার্জ দেবে। অর্থাৎ বাড়তি বন্দোবস্ত করতে হবে আবার ওদের সঙ্গে।

ড্রাইভার অতঃপর লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার এধার একবার ওধার ঘুরে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হল—এর উপরে আর সিকিখানা লোক চাপানো চলবে না। অতএব চারটে বাজল এবার। হুঙ্কার দিল, স্টার্ট দাও—

. নিজের সিটে গিয়ে বসল সে একটুখানি। তারের আলগা মুখগুলো জুড়ে গেঁথে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে বলে, মারো হ্যাণ্ডেল—

কণ্ডাক্টর হ্যাণ্ডেল ঢুকিয়ে দিয়ে বেদম ঘোরাচ্ছে। ষণ্ডা মানুষ—ঘোরাতে ঘোরাতে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। অবশেষে স্টার্ট হল। সে কী ভয়ানক গর্জন—শহুরে গাড়ি-চড়া আপনারা তার আন্দাজ পাবেন না। সমস্ত গাড়ি ঝড়ঝড় করে কাঁপছে। কাঁপুনির ঠেলায়, ভয় হচ্ছে, গাড়ির ছাত-মেজে কলকব্জা খুলে খুলে না পড়ে! অঞ্চলসুদ্ধ জেনে যাচ্ছে, হাঁ, মোটরবাস ছাড়ছে বটে এইবার!

ড্রাইভার নেমে এসে ইঞ্জিনের সামনে রাস্তার ধূলোর উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বিড়বিড় করে কি মন্ত্রপাঠ করে বনেটের উপর গোটা দুই থাবড়া মেরে আবার এসে বসল নিজের জায়গায়। চলেছে গাড়ি, হ্যাঁ মশায়, সত্যি সত্যি চলেছে। ধোঁয়া ছাড়ছে পিছনের নল দিয়ে—ধোঁয়ায় আর রাস্তার ধূলোয় চতুর্দিক অন্ধকার। থানা ছাড়িয়ে উকিলপাড়া ছাড়িয়ে পুলের ধারে এসে স্টার্ট বন্ধ করল। হুড়মুড় করে উঠে পড়ল মানুষজন। যত আগে ভিতরে ছিল, অন্ততপক্ষে তার ডবল। ছাত মাডগার্ড ফুটবোর্ড যেখানে যেটুকু জায়গা পেয়েছে, মানুষ দাঁড়িয়ে বা বসে যাচ্ছে। একজনে জায়গা পায়নি তো একটা রড ধরে ঝুল খেয়ে গাড়ি চলার তালে তালে শূন্য মার্গে পা দুলিয়ে চলল।

এরই বছর পাঁচ-ছয় পরের এক ব্যাপার। ভাইঝির বিয়ে। শ্বশুরবাড়ি হয়ে বাড়ি যাচ্ছি। রাতের ট্রেনে যশোর নেমেছি। দুই প্রাণী যাচ্ছি বটে আমরা, তবু সে একলাই। সকাল থেকে আলাপ বন্ধ। ভবিষ্যতে কখনো যে আবার আলাপ চালু হবে, তার কোন ভরসা দেখিনে। ঝামেলাটা বাধল খুলনায় এক জুয়েলারির দোকানে। ভাইঝিকে উনি পাথর-বসানো ব্রোচ দিতে চান। আমার ঘোরতর আপত্তি—ঝুটো পাথর, ধাপ্পা দিয়ে দাম হাঁকছে। তা ছাড়া, ব্রোচ পরা আজকাল তো উঠে গেছে কলকাতা শহরে। তার জায়গায় পলকা প্যাটার্নের ঐ সব দুলের ফ্যাসান চলেছে যার দাম ষোল টাকার ভিতরে। ব্রোচ এখন শুধু জংলি দেশেই চলে। নতুন বিয়ের বউ—স্পষ্টাস্পষ্টি বলি কি করে যে ইস্কুল-মাস্টারের ট্যাঁকে ষোল টাকার অধিক ভর সয় না। এমনিভাবে ঘুরিয়ে বলতে গিয়ে মহাবিপত্তি—মহিলা একদম বোবা হয়ে গেছেন।

মাঘের রাত্রি, বিষম শীত। বাস এখন আর একটা নয়—বাদামতলায় এগিয়ে দেখুন, আলো নিভিয়ে জানলা তুলে দিয়ে সারি সারি দশ-পনেরোটা পড়ে রয়েছে।

কেশবপুর কোনটা যাবে হে ?

নাসাগর্জন চতুর্দিকে। কে কার জবাব দেয় ? বসে পড়া যাক কোন-একটায় ঢুকে পড়ে, ছাড়বার সময় তখন খোঁজ নেওয়া যাবে। কিন্তু বসবেন কোথা ? বেঞ্চিগুলোয় মানুষ পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। দু-বেঞ্চির ফাঁকে মেজের উপরেও মানুষ। পগারের ওপারে চা-মিষ্টির দোকান। সেইখানে আলো—চালের বাতা থেকে হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে। দোকানি ডাকছে, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়—এই যে এদিকে।

গেলেই তো অন্তত পক্ষে এক কাপ চা খেতে হবে। কাকেই

বা জিজ্ঞাসা করি, শীতের রাত্রে গরম এক এক কাপ চা আরামদায়ক হবে কি না?

দোকানি ইতস্তত ভাব বুঝতে পেরেছে। বলে, বসুন না এসে। তা কি হয়েছে, গরজ না থাকলে খেতে যাবেন কেন? আজকে না খান, আর একদিন খাবেন।

অতএব আমি গিয়ে বসলাম দোকানির পাশে। যাবতীয় খবরাখবর নিচ্ছি। উনি বসেছেন ঐ প্রান্তে উল্টো দিকে মুখ করে। বিষম লজ্জাশীলা বলে ঠাউরেছে দোকানি। কেশবপুরের বাসটা চিনে নেওয়া গেল। ড্রাইভার হল পঞ্চু। ড্রাইভারের সিটটুকুতে পঞ্চু কুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে।

এই সেরেছে! পঞ্চু হালদার?

ফোঁস করে পঞ্চু যেন ফণা ধরে উঠল: কেন, কোন্ দিন অপঘাত হয়েছে? পঞ্চুর হাতে কতবার মরেছ শুনি?

তা যে যাই বলুন, এত ড্রাইভার আছে—পঞ্চুর মতো হাত কারো নয়। এক দোষ, বড় ঘুমকাতুরে। আষ্টেপিষ্টে মানুষ বোঝাই করে রাতদুপুরে ঐ আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ পথে পুরোদমে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। পরোয়া করে না। এক কাণ্ড ঘটে যায় বুঝি, ভয়ে ভয়ে চোখ বুজি। আবার দেখছি, তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে পঞ্চু নিজেও চোখ বুজেছে।

পঞ্চুরাম!

পঞ্চু রাগ করে বলে, কি হয়েছে, পঞ্চু-পঞ্চু করো কেন? অত ভয় লাগে তো নেমে পড়ে মাদারবক্সের ঘোড়ার গাড়িতে ওঠোগে।

চোখ বুজে চালিও না, সেই কথা বলছি—

চোখ বুজি আর মেলে থাকি, তোমার তাতে কি মশায়? গাড়ি ঠিকমতো চললেই হল।

শেষটা কিঞ্চিৎ নরম হয়ে ব্যাখ্যা করে বোঝায়, হররোজ চালাচ্ছি। পথ আগাগোড়া মুখস্থ। চোখে দেখতে হয় না আমাদের।

তারপরে দেখি শুধু মাত্র চোখ বোজা নয়—পঞ্চু হালদার পরম আরামে স্টিয়ারিং-চাকার উপরে মাথা রেখেছে।

ও পঞ্চু—

পঞ্চুরাম বড় বড় লাল চোখ মেলে খিঁচিয়ে ওঠে : বলছি তো। গাড়ি থামাচ্ছি, নেমে যাও। প্যাসেঞ্জারের কি অভাব আছে?

সেটা তো চোখেই দেখছি। এ সমুদ্রের এক ফোঁটা কমলে কি বাড়লে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু রাত দুপুরে মাঠের মধ্যে কোথায় নামি এখন? তা ছাড়া সঙ্গে যে আর একজনকেও নামতে হবে।

পঞ্চুরামকে শান্ত করি : আহা চটছ কেন? সিগারেট খাও একটা—সেইজন্য ডেকেছি। অন্য কিছু নয়।

সিগারেট আর দেশলাই সমাদরে হাতে দিলাম। সিগারেট ধরিয়ে পঞ্চুরাম প্রসন্ন হল। ঘুমের ভাবও খানিকটা কেটেছে। হেসে বলে, মশায় দেখছি বড্ড ভীতু। একদিন মরতেই হবে, মরার ভয় অত কেন? অমন হলে মোটরে চড়া যায় না।

মাঝে মাঝে এইরকম সিগারেট ধরাচ্ছি। নিজে চাঙ্গা হচ্ছি, পঞ্চুকেও দিচ্ছি ঘুম কাটবে বলে। শেষটা আমারও চোখ বুজে এলো। বাস চলেছে, ঘুমের মধ্যে আন্দাজ পাচ্ছি। চলতে চলতে হঠাৎ একসময়ে থেমে পড়ল। মণিরামপুর এসে গেল বুঝি? বড় গঞ্জ, অনেকক্ষণ থাকে এখানে, ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হতে দেয়, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে নেয় ইঞ্জিনে। নীরন্ধ্র অন্ধকার, কিছুই নজরে আসে না। তা সে যেখানেই হোক—পঞ্চুর গাড়ি থেমেছে যখন, চুপচাপ থাকুক বাকি রাতটুকু—আমার কোন আপত্তি নেই। হঠাৎ

ঠাহর হল, জল। বেঞ্চির উপর বসে আছি, জুতোসুদ্ধ পায়ের পাতা ডুবে গেছে জলের নিচে।

সবাই তুমুল কলরব করছেঃ হ্যাঁরে পঞ্চু, কোথায় এনে ফেললে ? এ যে অকূল সমদ্দুর!

পঞ্চুরামের ঘুম ষোলআনা ভেঙেছে এইবার। তাইতো—অ্যাঁ? রাস্তার উপর জল—বৃষ্টিবাদলা নেই, এত জল আসে কোত্থেকে ?

নেমে পড়ল ওদিককার দরজা খুলে। ছপছপ করে জল ভাঙছে। এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখে। ফিরে এসে নিশ্চিন্ত ভাবে বলে, না—বেশি দূর আসি নি। রাস্তার পাশের নয়ানজুলি এটা।

নয়ানজুলিতেই বা এলাম কেন ?

পঞ্চু রাগ করে বলে, আমি তার কি জানি ? জানলে আসতে যাব কেন ? কৈফিয়ৎ পরে নিয়ো। শীতের রাত্রে জলের মধ্যে থাকলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়ায় ধরবে, রাস্তায় উঠে কাপড়চোপড় ছাড় আগে।

হাঁটুভর জল নেমে দাঁড়িয়েছি। কনকনে হাওয়া দিয়েছে। সহসা শ্রীমতী কথা বলে উঠলেন, আমার ট্রাঙ্কটা নিয়ে যায় কে ?

যার জিনিস, তারই হাতে করে যাওয়ার নিয়ম।

এ কথার পরে সৃষ্টি তো লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার কথা। নিশিরাত্রে জলার মধ্যে এখন কিন্তু অন্য ব্যাপার। শ্রীমতী বললেন—সোজাসুজি আদেশ—ঐ ভারী বোঝা পেরে উঠব না। তুমি নাও।

পঞ্চু হতে এত বড় উপকারটা হল, পঞ্চু খাসা লোক। পরমানন্দে আমি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে নিলাম। পাকা রাস্তায় উঠে ট্রাঙ্ক খুলে দেখা গেল, জল ভিতরে ঢুকে গেছে। আড়াই ডজন শাড়ি—সমস্ত বরবাদ। শ্রীমতীর কণ্ঠও ভিজে ঃ পোড়ারমুখো ড্রাইভার!

বিনা বাক্যে আবার জলে নামছি। উনি সভয়ে বলেন, বাসে যাচ্ছ নাকি ? দেখ, এই রকম একা বসে থাকতে পারব না।

একা কোথায়? ঐ তো আরও কত নেমে আসছেন। এখুনি ফিরে আসব আমার ব্যাগটা বের করে নিয়ে।

না, থাকো এখানে। কোথাও যেতে হবে না, আমি বলছি।

তবু গেলাম। ব্যাগ আমি কোলের উপর নিয়ে বসেছিলাম; আমার ব্যাগে জল লাগে নি। ব্যাগ থেকে ধুতি বের করে দিলাম।

পরা হোক নয় তো নিউমোনিয়া ধরবে। ঐ যা পঞ্চু বলল।

শীতে কাঁপুনি ধরেছিল, এক কথায় রাজি সেইজন্যে। একটা বটগাছ রাস্তার উপরে, তার ওদিকে গিয়ে ধুতিটা পরে এলেন। আবছা আলোয় নিজের ধুতি-পরা চেহারার দিকে চেয়ে হেসেই খুন। বলেন, উঃ, কী হাল করল ড্রাইভার হতভাগা! আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে এসো তো ওকে।

নিশ্চয়—

দ্রুত পঞ্চুরামের কাছে গিয়ে পুনশ্চ একটা সিগারেট দিলাম।

খাও পঞ্চু—বেড়ে লোক তুমি, বাহাদুরি আছে। নয়ানজুলিতে নিয়ে গেলে—গাড়ি উল্টাল না, গায়ে আঁচড়টা অবধি লাগে নি। কারো কারো কাপড় ভিজে গেছে শুধু।

পঞ্চু সগর্বে হেসে বলে, হাত কি রকম, তাহলে বোঝ। রাস্তা থেকে নেমেই যখন যাবে, ব্রেক চেপে জোর কমিয়ে দিয়ে আবেশে ছেড়ে দিলাম। গুটিগুটি জলে গিয়ে দাঁড়াল।

ছাড়বে কতক্ষণে?

অনেক হ্যাঙ্গাম ভাই। সকালবেলা লোকজন ডেকে রাস্তার উপর তো তুলে আনি। চলবে কি অচল হয়ে থাকবে তখন বোঝা যাবে। তোমরা ও ভরসায় থেকো না, গরুর গাড়ি ভাড়া করে চলে যাও।

কিন্তু গরুর গাড়ির দরকার হল না। সবে ভোর হয়েছে। ভেঁপু বাজতে বাজতে দেখি, মাদারবক্সের গাড়ি আসছে। খালি

গাড়ি—ভিতরে একজন পুরুষ আর একটি মেয়েলোক। বটগাছের আড়ালে গা ঢাকা দেবার তালে ছিলাম, মাদারই ডাকল: আসেন, উঠে আসেন। পুরানো খদ্দের পথে ফেলে যাবো না।

শ্রীমতী ভিতরে উঠলেন। মাদারবক্স আমায় বলে, কেন মশায় খাঁচায় ঢুকছ! উনি থাকুন, কোচবাক্সে উঠে এসো তুমি।

পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ মাদার?

গাড়ি-ঘোড়া বেচে দিচ্ছি এ মাসের এই ক'টা দিন পরে। আমিও চলে যাচ্ছি মশায়—

বলো কি?

ঘোড়ার গাড়ি চলল না। আর দেরি করলে গাড়ি-ঘোড়া মাংনা দিয়ে যেতে হবে।

আর একবারের কথা—মোটরবাসের হাঙ্গামে আর এক মজার দুর্ভোগ। বাড়ি যাচ্ছি সেদিনও, যাচ্ছি কলকাতা থেকে। মাস্টারি করি, সে কথা তো শুনলেন। মেসে থাকি। অন্য কোন বিলাসিতা নেই, শনিবারে শনিবারে গ্রামে যাওয়া ছাড়া। অর্থাৎ শ্রীমতী আছেন গাঁয়ে। সে গ্রাম পাকিস্তানে পড়ে ইদানীং বিষম দুর্গম হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও যা ছিল—

মেসের প্রধান স্থূলবপু লাটুবাবুর কথাতেই বলি, এতও পারো! এই টানাপোড়েন করে লাভটা কি হয় বলো দিকি?

আসল লাভের কথা অভিভাবকস্থানীয় এই ভদ্রলোকের কাছে বলা চলে না। জবাব দিই, ট্রামগাড়ি রেলগাড়ি মোটরবাস খুব খানিকটা চড়া হয়ে যায়। সেই তো লাভ।

লাটুবাবু ঘাড় নেড়ে বলেন, তাই! ছুটোছুটিই সার। বাড়ি গিয়ে থাকতে পার কতটুকু! ওর চেয়ে বদরিকাশ্রমে যাও না কেন? অনেক কম হাঙ্গামা।

পরামর্শ নিঃসন্দেহ পাকা। বদরিকাশ্রম গিয়ে পৌঁছলে অশেষ পুণ্য। সিকি পথ গিয়ে ফিরে এলেও নিতান্ত পক্ষে একটা রোমহর্ষক বই লিখে অর্থলাভ ঠেকায় কে? কিন্তু ঐহিক জীব—তীর্থপথে মতি নেই। শনিবার সকাল থেকেই এটা-সেটা কিনে পুঁটলি বাঁধি এবং হাফ-ইস্কুলের দায় সেরে ছুটতে ছুটতে এসে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে শিয়ালদহে ধাওয়া করি।

এক শনিবারের গতিক দেখে মুখ শুকাল। মেঘে মেঘে আকাশ কালীবর্ণ। এমন নিশ্ছিদ্র আয়োজন বৃথা যাবে না। ঝড়-বাদলে পৃথিবী নিতান্তই যদি রসাতলে যায়—দুরু-দুরু বক্ষে কামনা করছি, সে পর্ব শুরু হোক আমার রওনা হবার মুখটা বাদ দিয়ে। ট্রাম হলেন মেজাজি গাড়ি—বৃষ্টির জলে চাকা নামাতে চান না। আর প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ইত্যাদি কর্তনের পর মাস-মাহিনা নীট সাড়ে-সাঁইত্রিশ—ট্রাম ছাড়া উচ্চতর যানের বিলাসিতা সম্ভবে না আমা হেন লোকের পক্ষে।

কাকুতিমিনতিতে বোধ করি করুণার্দ্র হয়েই দেবরাজ গোলযোগ ঘটালেন না। শুধু ভ্রূকুটি করে রইলেন, আর একটু-আধটু হুঙ্কার দিতে লাগলেন মাঝে মাঝে। ট্রেনেও চেপে বসা গেল। তারপর থেকেই বৃষ্টি। অবিরল চলেছে। ঘণ্টা চারেক পরে যশোর পৌঁছানোর পর তখনও থামবার লক্ষণ নেই। সারি সারি জলপ্রপাত নেমেছে যেন স্টেশনের ছাতের নল দিয়ে। পথঘাট জলময়। সামনের রাস্তা দিয়ে খরবেগে স্রোত চলেছে। অত্যুৎসাহী কয়েকজন খেপলা জাল বাইছে পাকা রাস্তার উপর মাছের প্রত্যাশায়। পাচ্ছেও কিছু কিছু।

ঘসা-কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে যেমন লাগে, তেমনি হয়েছে চতুর্দিক। ট্রেন দাঁড়িয়ে হাঁসফাঁস করছিল—ভাঙা গলার আর্তনাদের মতো হুইসিল দিয়ে এবার ছেড়ে গেল। চোখে স্পষ্ট কিছু দেখছি

নে—সারবন্দি কতকগুলো আঁলো যেন ছুটে পালাল দুর্যোগের অঞ্চল থেকে।

শহর এখান থেকে দু-মাইল। কেশবপুরের বাস স্টেশন থেকে লোকজন কুড়িয়ে নিয়ে যায়। কি হল, আজকে বাস কিছুতে আসছে না।

একজন সহযাত্রীকে প্রশ্ন করি, ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল—বাস আসে না কেন বলুন তো?

মোটঘাটের উপর চেপে বসেছিল লোকটি। হাই তুলে নড়ে চড়ে সে বলল, কি জানি! বোধ হয় আর এলো না। ঠাণ্ডার মধ্যে আরামসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কে ঘুমুচ্ছে মশাই? লাইনের গাড়ি?

তা গাড়িই ঘুমুচ্ছে ধরে নিন। ইঞ্জিনের উপর এক এক ত্রিপল চাপিয়ে চৌরাস্তায় দেখুন গিয়ে সারবন্দি মুড়ি-সুড়ি দিয়ে রয়েছে।

বলেন কি? সব মাটি যে তা হলে!

সকালে যেতে পারবেন। দিনে দিনে চলে যাবেন—সেই তো ভাল। শুয়ে পড়ুন পুঁটলি মাথায় দিয়ে।

তাকিয়ে দেখি, অনেকেই সেই পন্থা ধরেছেন ইতিমধ্যে। স্টেশন ঝিমিয়ে পড়েছে। উদ্বেগে স্থির থাকতে পারিনে। একবার জল ভেঙে রাস্তার বাঁক অবধি গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিই, পরক্ষণে ছুটে চলে আসি পুঁটলির আকর্ষণে। জায়গাটা সেদিক দিয়ে খ্যাতিমান। মহাত্মা গান্ধীর খদ্দরের ঝুলিটাও লোপাট হয়েছিল, শুনতে পাই, কোন একবার সভাভঙ্গের পর।

চারিদিকে চটাপট আওয়াজ—জবর বক্তৃতার মুখে যে রকমটা হয়। অর্থাৎ মশক-বাহিনী আক্রমণ করছে। হিতোপদেশ কানে না নিয়ে এক হাতে জুতাজোড়া আর এক হাতে পুঁটুলি—হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বীরপদক্ষেপে নেমে পড়লাম জলের ভিতরে।

গিয়েছিলাম ভাগ্যিস। গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো—স্টেশনে আর যাবে না। ড্রাইভার ঘাড় নাড়ল, জায়গা কোথা?

কী রকম কথা ভাই! এত দুর্ভোগ ভুগে এদ্দূর অবধি চলে এলাম—

দুর্ভোগে আমরাও ভুগছি মশায় সেই দুপুর থেকে। কিছুতে স্টার্ট নেবে না—ঠেলেঠুলে স্টার্ট নিল তো তিন কদম গিয়ে আওয়াজ করে টিউব ফাটল। গরু-ঘোড়া নয়, কল দিয়ে গাড়ি টানানো—সোজা ব্যাপার? 'এই এতক্ষণে এবারে একটু চাঙ্গা করা গেছে।

খোশামুদি সুরে বলি, নাও ভাই ওর মধ্যে আমায় একটু ঢুকিয়ে। বাড়িতে মহামারী বিপদ।

ঢুকিয়ে? ওরে আমার আহ্লাদ! আপনি তো আস্ত এক মানুষ—চেষ্টা করুন দিকি, শুধু একখানা হাতই ঢোকে কিনা!

ঝুলে ঝুলে যাব। আর তকরার কোরো না ভাই। যেতেই হবে। দখল সাব্যস্ত করবার উদ্দেশ্যে পুঁটলিটা ঠেলে দিচ্ছি, কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে আসে বার বার। ভিতরের লোকেরা সূচ্যগ্র পরিমাণ দ্রব্য ঢুকতে দিতে রাজি নয়। ড্রাইভার দয়াপরবশ হয়ে বলল, আমায় দিন। দিয়ে এগিয়ে যান। বিজয় কুণ্ডুর ইটখোলা ছাড়িয়ে পুলের ধারে গিয়ে দাঁড়াবেন।

সেই পুলের ধার—জায়গাটা জানেন তো আপনারা। মাইল খানেক পথ অন্তত। সেখানেও জন দশ-বারো অপেক্ষমান।

গোপাল্ না?

গোপাল কর্মকার আমাদের বিশেষ অনুগত। তার মতে, লোহা পিটে নয়—মানুষ পিটিয়েই হাতের সুখ। এবং আনুষঙ্গিক মোকদ্দমার তদ্বিরে হামেশাই তাকে সদরে আসতে হয়। সামান্য বিশ মাইল পথ মাত্র—মুখ-আঁধারি থাকতে বেরোয়, আদালতের

কাজ সেরে সন্ধ্যার পর বাড়ি পৌঁছে কামারশালে বসে লোহা পেটে। এমনি হয়ে আসছে।

আজকে যে বড় গাড়ি চাপছ গোপাল ?

পা জখম আছে। কুকুরে কামড়েছে।

শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষ্যাপা কুকুর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অবনীধন। বিষম ক্ষেপেছে।

অবনীধন লোকটা চিরদিনের ক্ষ্যাপা। কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে কামড়াবে, এতখানি বিশ্বাস হওয়া শক্ত। তখন গোপালই রূপকটা পরিষ্কার করে দেয়।

নষ্টচন্দ্রের দিন অবনীর মানকচু ক'টা তুলে আনতে গিয়েছিলাম। চুপচাপ বাড়ি, রামায়ণের মহলা হচ্ছে না—কি করে বুঝব, বেটা ঘরে বসে আছে, গান গাইতে যায় নি। তাড়া দিয়েছে—আর বেড়া লাফাতে গিয়ে এই এক গোঁজা ফুটে গেল উরুতে। আবার শুনছি, চুরির বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে এর উপর।

ভাল হল। বাড়ি অবধি এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

বাস থেকে নেমেও ফের হাঁটনা। গাঙ পার হতে হয়। সীমাহীন পাট ও ধানক্ষেত, কদাচিৎ বা গ্রাম—শ্মশানঘাটা। নিশিরাত্রে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল—গোপালের মতো দুর্দ্ধর্ষ সঙ্গী। নির্ভাবনা হওয়া গেল।

পথের মধ্যে বার চারেক আরও বাস বিগড়াল। নামিয়ে দিল, তখন রাত সওয়া-একটা। দুক্রোশ পথ এখনো—পা দু-খানা ছাড়া অন্য যান নেই। গল্পটা আর একটু শুনবেন নাকি—বাড়ি গিয়ে কি কাণ্ডটা হল ? কিন্তু খবরদার, চাউর হয় না যেন। এই যা শুনলেন, মুখে কুলুপ এঁটে রাখুন। নইলে মারা পড়ব।

এত যে বৃষ্টিবাদলা—আমাদের তল্লাটে সন্ধ্যাবেলা ছোট এক পশলা মাত্র হয়ে গেছে। তবে আকাশ অন্ধকার। চোখে দেখে

পথ চলবার উপায় নেই—পা ঘষে ঘষে আন্দাজে এগোচ্ছি ঘাসবন যেখানে পায়ে ঠেকে না—সেইটে বুঝে নেবেন পথ।

উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম। জনশূন্য। ব্যাপার কি? ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। পুঁটলিটা গোপাল দাওয়ার উপর ফেলে সরে পড়েছে। একাকী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

পশ্চিমের ঘরে শিকল-খোলার শব্দ। ঘরটা একটেরে। চোর সন্দেহে ছুটে গেলাম সেদিকে। একটা বাঁশের টুকরোও নিয়েছি কুড়িয়ে।

কে? আরে—ভোলা-কাকা যে! এরা সব গেল কোথা বলুন তো?

দত্ত-বাড়ি রামায়ণ শুনছে। এক একবার বাড়ি এসে আমি দেখে যাচ্ছি, সব ঠিক আছে কিনা। তা তুইও চল্—গান ভাঙলে এক সঙ্গে আসবি।

অবনীধনের গান? তাই মত্ত হয়ে শুনছ এত রাত্তির অবধি?

ভোলা-কাকা বললেন, প্যাঁচে ফেলে শোনাচ্ছে রে বাবা। পালায় কার সাধ্যি?

অবনীধন রামায়ণের দল করেছে। দর অতি সস্তা—কেরোসিন ও উপস্থিত শ্রোতাদের পান-তামাকের খরচটা দেবেন—আপনার বাড়ি গেয়ে আসবে। সামিয়ানার অনুকল্পে উঠানে খান দুই শাড়ি বেঁধে যৎসামান্য আচ্ছাদন করে নেওয়া, এবং লোকের বসবার জন্য শপ-সতরঞ্চি ও নারিকেল-পাতা সংগ্রহ—সমস্ত দায় ওদের। পেলার থালায় দুটো-চারটে পয়সা কি রেকাবিতে করে চাল-কলা বেগুন-মূলোর নৈবেদ্য কেউ দেয় তো সেই মাত্র প্রাপ্য। নিজ গাঁয়ের দল বলে নৈবেদ্য-পেলা না-ও যদি দেয়, তাতে গররাজি নয়। মোটের উপর, গান শোনানো নিয়ে কথা।

সেই সরস্বতী-পূজার দিন থেকে যখনই গাঁয়ে আসি, অবনীধনের বাড়ি ডামাডোল শুনতে পাই। রামায়ণের মহলা। হারমোনিয়াম আছে—তার একটা রিড টিপলে দশ রকম সুর বেরোয়। তার উপর ঢোল। এক ঘুমের পরও গ্রামের লোক ঢোলক-বাদ্য শোনে। সকলে বলাবলি করে, ভাল হয়েছে—চোরে হঠাৎ পাড়ায় ঢুকতে সাহস করবে না।

প্রথম গাওনা হয় ডাক্তারবাবুর বাড়ি। ডাক্তারবাবুর বিপুল উৎসাহ সব ব্যাপারে। রোগি সারা অঞ্চল জুড়ে। হাটে তিনি কাড়া দিয়ে দিলেন, অমুক দিন রামায়ণ গান হবে—সবাই এসে গান শুনবে, পান-তামাক খাবে।

সে সময়টা ইস্কুলে গ্রীষ্মের বন্ধ—পুরো এক মাস আমি বাড়িতে। বিষম ভিড়; ডাক্তারবাবুর বিশাল সদর-উঠান ভরে গেছে। বিড়ি-সিগারেটের দোকান বসেছে কতকগুলো—হরদম বিক্রি তাদের। অবনীধনের আনন্দের অবধি নেই। সে-ই মূল-গায়েন—গেরুয়া আলখেল্লা পরে চামর হাতে আসরে ঢুকল। ঘণ্টাখানেক পরে—পালার সিকির সিকিও সমাধা হয় নি—লক্ষ্য করা গেল, আসর প্রায় খালি। পাড়াগাঁয়ের মানুষ ধর্মকথার আসর থেকেও উঠে চলে গেছে—গানের বিক্রম বুঝে নিম এর থেকে। অবনীধন বোকা নয়, অবস্থা বুঝতে পেরেছে। মরমে মরে গেল সে। পরের দিন ভিন্ন গ্রামে গাওনা হবার কথা; বায়না ফেরত দিয়ে এল। বিপুলতর উদ্যমে আবার মহলা শুরু হল—দিনে রাত্রে কোন সময় ঢোলের বিরাম নেই।

চৈতন মোড়ল বিষম সঙ্গীতোৎসাহী। ডাক্তার বাবুর গানের দিন সে গ্রামে ছিল না—মেয়ের বাড়ি গিয়েছিল নাতির অসুখের খবর পেয়ে। ফিরে এসে আচ-কাচ করে: আহা, পয়লা দিনটা আমি শুনতে পেলাম না! কি রকমটা হল, বলেন দিকি বাবু—

অবনী বলে, পাঁচ-সাত পালা গাইতে পারলে বাড়িতে দালান-কোঠা উঠে যেত।

বলেন কি ? বিস্ময়ে চৈতনের চোখ কপালে ওঠে। অবনীর সম্বন্ধে তার অসীম প্রত্যয়। হেসে ঘাড় নেড়ে বলে, তবু কিনা ব্যারো শালা যা-তা বলে বেড়াচ্ছে।

অবনী সুরসিক ব্যক্তি। বলে, তা বড় মিথ্যে বলছে না। গোটা কয়েক আসর বসালে এত ইট পড়বে যে, তাই জমিয়ে স্বচ্ছন্দে দালান গাঁথা চলে।

অনেক দিন ধরে বিস্তর রিহার্শালের পর দত্ত-বাড়ি গাইতে নেমেছে। ভবানী-বিষয় সারা না হতেই বোঝা গেল, অবস্থার ইতরবিশেষ হবে না আজকের আসরেও। ত্রুটি মূল-গায়েন অবনীরই। ঈশ্বর মেরে রেখেছেন। এমন কাটখোট্টা গলা—গান গাইবার সময় মনে হয়, কে যেন শুকনো তেঁতুল-কাঠে কুড়াল মারছে। ইতিমধ্যে পান-বিড়ি খাবার ছুতোয় আসর থেকে উঠে সরে পড়ছে কেউ কেউ।

এত কষ্ট করে পালার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করেছে, শেষ অবধি শুনবে না কেউ ? বৃথা এত আয়োজন ? রামের অপার মহিমা! খাঁ করে বুদ্ধি এসে গেল অবনীর মাথায়। অকাট্য কৌশল। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা শুরু করেছে—দু-চার কথায় শক্তিশেলে ধরাশায়ী করে ফেলল লক্ষ্মণকে। ব্যস, আর ভাবনা নেই। পালা তারপরে অতি মন্থরগতিতে চলল। শুরুতে যে-সব গান ও বর্ণনা হবার কথা, লক্ষ্মণকে বধ করে এখন নিরুদ্বেগে চলে সেই সমস্ত। শ্রোতাদের নড়বার জো নেই। মৃত অবস্থায় রামানুজকে ফেলে কোন্ পাপিষ্ঠ ঘরে যাবে ? পরলোকের ভয় নেই ? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমিও গিয়ে বসেছি আসরে। আড় চোখে বিজয়ীর দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে অবনীধন অবিরাম গেয়ে

চলেছে। লক্ষ্মণের পুনর্জীবনের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শ্রোতারা ছটফট করছে, আর অবনী হাসছে বোধ করি মনে মনে।

আর না পেরে খুড়ি মা আসরের ঠিক সামনে অবনীধনের কাছে উঠে এলেন। কাকুতিমিনতি করেছেন, বাবা অবনী, বাঁচিয়ে দে লক্ষ্মণকে—আর ঝঞ্ঝাট করিস নে। ছেলেটা কোন্ মুল্লুক থেকে এলো, সবাই আমরা আটক হয়ে রইলাম—তাকে ভাত-জল দিতে পারছি নে। দোহাই বাপু, ছেড়ে দে।

কিন্তু অনুরোধ-উপরোধ অবনী কানে নেয় না। লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে আসর খালি হয়ে যাবে, তা সে জানে। ভাণ্ডারে যত কিছু আছে, সব শুনিয়ে দিয়ে তারপরে বাঁচাবে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির অপমানের শোধ নিচ্ছে। চামর দুলিয়ে নেচে নেচে সে রামের বিলাপ গাইছে :

> উঠ রে লক্ষ্মণ, মেল রে নয়ন, কত নিদ্রা যাও—
> রজনী হয় শেষ, কতই দিবে ক্লেশ, নয়ন মেলিয়া চাও।

করুণ চোখে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মনের কথাটাই টেনে নিয়ে গাইছে যেন অবনী।—কতই দিবে ক্লেশ ? একটানা এই ধুন্দুমার চিৎকারে ওদেরও কি একটু ক্লেশ হয় না ? দোয়ারেরা চোখ বুজে দিব্যি দুলে দুলে ধুয়া দিচ্ছে :

> রামের বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে ?
> ও রামের বিচি-ই-ই—ত্র—

এর পরের টুকুও শুনবেন নাকি ? কিন্তু পুনশ্চ সামাল করছি। খবরদার, খবরদার—ফাঁস হয়ে না যায় !

অনেক ভোগান্তির পরে অব্যাহতি পেলাম শেষটা। বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছি। রাত বেশি নেই, পূবে ফরশা দিল বলে। গলা বসে অপারগ হয়ে পড়ায় অবনী ক্ষান্ত

দিয়েছে, নইলে রাতটুকু নির্ঘাৎ সে কাবার করত। পড়ে আছি বিছানায়, ঘুম নেই। আরও কতক্ষণে না জানি আগমন হবে। আক্কেলটা দেখুন—মৌজ করে গান শুনে আসা হল, এখন রান্নাঘরে পা মেলে বসে দীর্ঘচ্ছন্দে খাওয়া চলছে। কী এত খাচ্ছে রে বাপু! একবার ইতিমধ্যে ঘুরে দেখেও এসেছি চুপিচুপি। টেমির ক্ষীণ আলো—তার সামনে খেতে খেতে রাত্রির এই শেষ প্রহরে ক'টি জায়ে-ননদে খুব হাসাহাসি চলছে। অর্থাৎ মুণ্ডপাত হচ্ছে অবনীর। আমার মেয়াদ এই তো আর সামান্য ক্ষণ। দুপুরবেলা নাকে-মুখে গুঁজেই আবার রওনা হয়ে পড়ব। এরই জন্য কত দুঃখভোগ করে এসেছি। পালার আলোচনাটা কালকের জন্য মুলতুবি রাখা গেল না? অভিমানে জল এসে যায় চোখে। বয়সটাই অমনি—সামান্য কারণে জল আসত।

* * *

অন্ধকার ঘরে মৃদু পদধ্বনি।

না এলেই হত!

কি করি বলো। সবাই আরম্ভ করে দিলেন—আমি ওর মধ্য থেকে উঠে আসতে পারি? এমনই মুখ টিপে টিপে হাসছে কত!

বিছানায় এসেছেন। ঝুঁকে পড়লেন—দু-খানা কোমল হাত এলিয়ে দিয়েছেন কাঁধের দু-দিক দিয়ে।

রাগ করেছ? যা হচ্ছিল আমার মনের মধ্যে! কিন্তু কি করব বলো?

সময়াভাবে বেশি রাগারাগি আর হয়ে উঠল না। রাতের দু-তিন ঘণ্টা মাত্র আছে—এইভাবে তা পণ্ড করব, এতখানি আহাম্মক নই আমি। ক্ষমা করে নেওয়া গেল।

আজকে কোন্ তারিখ মনে আছে?

তারিখ?

বিড়-বিড় করে তারিখের হিসাব হচ্ছে। কৃষ্ণের জীবকে কষ্ট দিতে নেই—বলে দিলাম, সাতাশে শ্রাবণ। কত বড় আনন্দের দিন ভাব তো আজকে!

অবস্থা আন্দাজ করতে পারছি। বছরের তিন শ পয়ষট্টি দিনের আর সব ক'টাকে বাতিল করে সাতাশে শ্রাবণ কেন আনন্দের আকর হয়ে উঠল—কিছুতে তার হদিশ হচ্ছে না।

এই দিনে বিয়ে হয়েছিল না আমাদের?

ওঃ, এতও মনে থাকে তোমার!

এই পরম দিনে একটা স্মৃতি-উপহার এনেছি—

অতঃপর উৎসাহের আর অবধি রইল না। তড়াক করে উঠে বসলেন।

কি? কি এনেছ?

মুখে বলব না তো। দেখি, হাতে পরিয়ে দেব আমি—

ও হরি! জিনিষটা বের করাই হয় নি। গোপাল সেই ফেলে গিয়েছিল—পুঁটলি সেখানেই পড়ে আছে। দাওয়ায় ছুটলাম। শশব্যস্তে আলো জ্বেলে শ্রীমতীও এলেন সেখানে। পুঁটলি খুলছি—

দেখি হাত—

হাসি-মাখা স্নিগ্ধ চোখ তুলে—না, হাত দু'টি বাড়িয়ে ধরা নয়, ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন পুঁটলির উপরের দিককার কাগজের মোড়কটি।

কিন্তু হাতের নয় তো, পায়ের জিনিষ। চটিজুতা। নতুনও নয়—অতি জীর্ণ, একশ' গণ্ডা তালি-মারা।

তখন ঠাহর হল, পুঁটলি বদল হয়ে গেছে। ড্রাইভার অন্য কার পুঁটলি দিয়েছিল গোপালের হাতে—একই রকম গামছায় বাঁধা। চটির অতি-সাবধানী মালিক বৃষ্টিবাদলা দেখে মহামূল্য বস্তুটা কাগজে মুড়ে পুঁটলিতে ঢুকিয়েছে।

তারপরে—উঁহু, আর নয়। এই যদ্দুর হল, তার ফলে কি আছে আমার কপালে, জানিনে।

এই সেদিনও আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। বলেছি তো, গ্রাম-ঘরবাড়ি এখন পাকিস্তানে। ঢোকবার মুখে বুক দুরুদুরু করে।

মাইকেল মধুসূদনের জন্মগ্রাম সাগরদাড়ি। আমার বাড়িও ঐ অঞ্চলে, একই কেশবপুর থানার এলাকায়। কত জায়গায় বেড়িয়েছি, তলস্তয়ের জন্মস্থান দেখে এসেছি—কিন্তু সাগরদাড়ি দেখা হয়নি। এক রকম ঘরের পাশে বললেই তো হয়—পাঁচ-ছয় ক্রোশের ভিতর—উদ্যোগ করে দেখে এলেই হবে একদিন। এই ছিল মনোভাব।

তারপরে স্বাধীন হলাম; হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে সীমান্ত চিহ্নিত হল। চলাচল ভারি কঠিন এখন। সাত-পুরুষের ভিটেমাটি দেখতে যাব, তার জন্যে পাশপোর্ট কর, ভিসার লাইন দাও—বিস্তর বখেড়া। বর্ডারের কর্তারা গোড়াতেই ধরে নেবেন, বেটা এক নম্বর ফেরেব্বাজ। তদনুযায়ী পোঁটলা-পুঁটলি খুলে ছড়াবেন, কোমর টিপবেন, পকেট হাতড়াবেন। হরেক রকম প্রশ্ন। কথাবার্তা চোস্ত উর্দু জবানে হচ্ছে—আমাদের ওদিকে কোন পুরুষে কেউ এসব শুনি নি, পনের আনা বুঝতে পারি না, বুক ঢিবঢিব করে। যাই হোক, বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যে ছাড় মিলল অবশেষে—শেষ কর্তাটিও হাত নেড়ে দিলেন। অর্থাৎ বেরুতে পার এবার।

বর্ডারে এসে ঘাবড়ে যাই, কিন্তু এলাকায় ঢুকে পড়লে আর কিছু ঝামেলা নেই। সেই পুরানো মানুষ, পুরানো জগৎ। আড়গড়া পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে দেখি, কপালক্রমে জীপ একখানা।

আসেন, আসেন—যশোর যাবেন তো? রেল-ভাড়া আর এখান থেকে স্টেশন অবধি রিক্সা-ভাড়া, আর তার উপরে একটা

টাকা বখশিস ধরে দেবেন—এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেব। রেলের কামরায় ধুঁকবেন কি জন্য সন্ধ্যে অবধি?

এর চেয়ে সাধু প্রস্তাব আর কি হবে? উঠে বসেছি। তারপর যত এগোচ্ছি, দরদাম ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। বেনাপোল স্টেশনের সামনে এসে একেবারে সদাব্রত। উঠে পড়ো, উঠে পড়ো—এক ঘণ্টায় যশোর—যে যা পার, দিও। এই জীপ গাড়ি চড়ে কোন হোমরা-চোমরা বর্ডারে এসেছিলেন, তিনি পার হয়ে গেছেন। খালি জীপ এমনিই যশোয় যেত—ড্রাইভার সাহেব ফোকটে কিছু রোজগার করে নিচ্ছেন।

আসল সভাটা পরশু দিন সাগরদাড়ি গিয়ে—যশোর থেকে সাতাশ-আঠাশ মাইল পথ। আজকে শহরেও একটু ছোটখাট আয়োজন—আছেন যখন রসনা কিঞ্চিৎ ঝালিয়ে নিন। সভাস্থান দেখে মুশড়ে যাচ্ছি। যে-বাড়িতে এসে উঠেছি, ওঁদের বারাণ্ডার লাগোয়া খান দুই তক্তপোশ পেতে বক্তাদের জায়গা। সামনে হাত আষ্টেক চওড়া উঠানের ফালি, তার ওদিকে মস্ত পগার। এবং তারপরেই সদর-রাস্তা। ঐটুকু উঠানে ক'টা লোক বসবে, আর কী-ই বা সভা হবে!

লোক আসতে শুরু হল। গোটা পাঁচ-সাত মাদুর পেতে দিয়েছে—ভরে গেল দেখতে দেখতে। তারপরে খালি জায়গায় বসেছে। পগারের গর্ভেও মানুষ। হাটবার—হাটে যেতে যেতে মানুষ থমকে দাঁড়াচ্ছে। কী ব্যাপার? মাইকেলের স্মৃতিসভা। কে মানুষটি মাইকেল? বড় কবি—বাংলায় কাব্য লিখেছেন, এই যশোর জেলারই মানুষ ছিলেন তিনি। অক্ষর-পরিচয় না থাক, বাংলা ভাষায় বই লিখেছেন এই যথেষ্ট তাদের কাছে। এর চেয়ে পেয়ারের মানুষ আর হতে পারে না। ধামা-ঝুড়ি নিয়ে হাটুরে মানুষ সদর-রাস্তার উপর বসে পড়ছে। সভা শেষ হয়ে গিয়ে

তারপরেও হাট থাকে তো বেসাতি করবে; নয়তো আজকে রাত্রে হরিমটর। সদর-রাস্তাও ভরে গেল; গাড়ি-ঘোড়া অন্য পথ ঘুরে যাচ্ছে। ক'টা আমগাছ উঠানের পাশে—তার ডালে ডালে লোক। একজনে আঙুল দিয়ে দেখায়, কত মানুষ-ফল ফলেছে ঐ দেখুন। শ্রোতারা অপলকে মুখের দিকে তাকিয়ে—চোখের দৃষ্টি দিয়ে কথা সমস্ত টেনে টেনে আদায় করছে যেন, হাঁ করে গিলছে প্রতিটি কথা।

সভার পরে একটু ঘুরতে বেরিয়েছি। কলকাতায় সে সময়টা ভাল কলম পাওয়া যাচ্ছিল না, এখানে পাই তো কিনে নিয়ে যাব। তা পেলাম পছন্দসই একটি। দোকানদার খুব খাতির করে চা-পান খাওয়ালেন। কলম তিনি আলাদা করে রেখে দেবেন, যাওয়ার দিন নিয়ে যাব। যার কাছে যাচ্ছি, নিমন্ত্রণ করছে। থাকব শুধু কালকের দিনটা—তবে তো সকল কাজকর্ম ফেলে এবাড়ি-ওবাড়ি সারাদিন খেয়ে বেড়াতে হয়। হাহাকারও শুনছি কারো কারো মুখে। চারিদিক চেয়ে চুপিচুপি বলছেন, কী হয়ে গেল দেখুন দিকি! এই শহরে আগেও তো ঘুরেছেন। শুয়ে বসে সোয়াস্তি পাইনে—যাকে দু-চোখে দেখি, লাটবেলাট বলে তোয়াজ করে যাই। হিন্দুস্থানের পারে কোন-একটু গোলমাল বাধল তো আমাদের বুক ধড়াস-ধড়াস করে, এই রেঃ, লেগে গেল বুঝি! স্বাধীনতার পয়লা মওকায় হিন্দুতে মুসলমানে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলাম, তারই স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

এক উকিল বাবুর সঙ্গে পুরানো জানাশোনা। কোর্টের পর বাসায় ফিরে এসে বলতেন, চারটে পয়সা দাও দিকি কাকীমা, চা খেয়ে আসি। অর্থাৎ চারটে পয়সাও পকেটে আসে নি সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি করে। সেই ভদ্রলোক, দেখি, ভুঁড়ি বাগিয়ে বসেছেন ইতিমধ্যে। একগাল হেসে বললেন, ভাগ্যিস পাকিস্তান হয়েছে

মশায়। মক্কেলরা ঘিরে বসে আছে, আমার সঙ্গে ঐ একটি কথা বলেই উকিলবাবু আবার খসখস করে আরজি লিখে চললেন। ফুরসৎ নেই। বাঘা-বাঘা উকিলরা সব হিন্দুস্থানে চলে এসেছেন—আদালত-পাড়ায় শাহান-শা তিনি এখন। আর এক মুসলমান ভদ্রলোক—ডাক্তার তিনি, রোগির বাড়ি ছুটে কূল পান না। মুখ বেজার করে বললেন, কী সর্বনাশ হল ভাই এই ভাঙাভাঙি হয়ে! পয়সা পাচ্ছি বটে, কিন্তু মরে গেলাম—ভাল একখানা বই পাই না পড়তে, মনের মতন একজন মানুষ পাইনে যে দিল খুলে কথাবার্তা বলি···

খান দুই জীপ নিয়ে রওনা হওয়া গেল সাগরদাড়ি। কেশবপুরের সেই রাস্তা। কোন্ গাছটা কোথায়, তা-ও বলে দিতে পারি। ড্রাইভারকে আমিই সামলাচ্ছি: আস্তে চালান; ভাঙা পুল সামনে—কাঠ বসিয়ে পেরেক মেরে রেখেছে। সতীঘাটার বাঁক—বাঁশঝাড় নুয়ে পড়েছে রাস্তায়। প্রায় সমস্ত মিলে যাচ্ছে। ভিন্ন রাষ্ট্র হয়েও রাস্তার কিছু ইতরবিশেষ হয় নি। ড্রাইভার অবাক হয়ে তাকায়। আরে ভাই, বত্রিশ নাড়ির পাকে পাকে বাঁধন যে এখানকার সঙ্গে। আজকেই না হয় বিদেশি বনে গিয়েছি।

কেশবপুর থেকে আরও সাত-আট মাইল মাটির রাস্তা, এ পথে যাই নি আর কখনো। পথও নতুন আনকোরা। আগে মাঠ ভেঙে আ'ল বেয়ে যেতে হত। এখন সোজাসুজি পথ বেঁধেছে—শেষ হয়নি যদিচ—নাম মাইকেল রোড। এবারের শীতকালে শেষ হল না, আরও এক মরশুম লাগবে। মজার কাণ্ড দেখছি। কাতারে কাতারে মানুষ যাচ্ছে—পুরুষ-মেয়ে, ছেলে-বুড়ো। কোথায় যাবে? সাগরদাড়ির সভায়। ছঁই-দেওয়া গরুর গাড়ি করে যাচ্ছে মেয়ে-বউরা দূরের গ্রাম থেকে—কোথায় গো? সাগরদাড়ি। পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের গ্রাম থেকেও আসছে। ক্রোশ বলতে আপনাদের ইংরেজি

মতে দুই মাইল বুঝবেন না কিন্তু—আমাদের পাড়াগাঁয়ের ডাল-ভাঙা ক্রোশ। অর্থাৎ গাছের একটা ডাল ভেঙে নিলেন—সেই ডালের পাতা যত দূর গিয়ে নেতিয়ে পড়ল, সেইখানে ক্রোশ পুরল। জীপ দেখে তটস্থ হয়ে সকলে পথ ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে। সভার মাতব্বর আমরা—এবং কবিও বটে (বই লিখলেই কবি—গদ্য-পদ্যর অত ফারাক বোঝে না আমার দেশের মানুষ)। অতএব জীপ অচল হয়ে পড়লে সাত মাইল পথ কাঁধে করে পৌঁছে দিতেও আপত্তি নেই এদের।

শেষ মাইল তিনেক আর পথ নেই, মাটি ফেলা এখনো হয়ে ওঠেনি। মাঠ ভেঙে খাল-বিল ঝাঁপিয়ে এর পুকুর-পাড় ওর ঘরের কানাচ দিয়ে যাচ্ছি। জীপ আটকে গেল তো ক্ষেত থেকে চাষীরা ছুটে এসে কোদাল ধরে রাস্তা চৌরশ করে দিচ্ছে, জঙ্গল সাফ করছে। আরও খানিকটা গিয়ে দেখি, শ' খানেক মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এগিয়ে নেবার জন্য। বাংলা সাহিত্যের ধ্বজা বয়ে চলেছি—বুঝুন তা হলে কি দরের মানুষ আমরা! খাতির দেখে বুঝে নিন।

কপোতের চোখের মতো স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষীর কূলে এসে দাঁড়িয়েছি। ঘাটের উপরে মার্বেল-ফলকে কবিতা খোদাই করা—'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে···'। ছোট্ট মধুসূদন সাঁতার কাটতে কাটতে চলে আসতেন এই এতদূর।

প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের সামনে প্রশস্ত উঠান জুড়ে সভা। দেশ-বিদেশে বিস্তর বড় বড় সভায় বসেছি, কিন্তু এমন কাণ্ড দেখব না। লোকে লোকারণ্য—পনের আনাই নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী। মাইকেলের কথা শোনবার জন্য কাজকর্ম কামাই করে কখন থেকে বসে আছে; চাঁদা দিয়েছে দু-আনা চার আনা করে। এদেরই পয়সায় জীপ চড়ে নবাবি করে এসেছি। হুড়মুড় করে ইট খসে

পড়ল মাইকেলের আদি-বাড়ির ছাতের কার্নিশ থেকে। ভাগ্যিস ঘাড়ে পড়েনি কারো। উহু, একজনও থাকতে পাবে না আর ওখানে ; জীর্ণ ছাত ভর সইতে পারবে না। উলুক্ষেতে সারবন্দি গরুর গাড়ি রয়েছে। পান বিড়ি ও ডাবের দোকান বসেছে সত্তর-আশিটা। টেমি জ্বেলে খুব বেচা-কেনা করছে। মুখ-কাটা ডাবে পাহাড় জমে উঠল। ফেরার পথে কানে গেল, দোকানিরা বলাবলি করছে, এত বড় লোকের জন্মদিন একটা দিনে সারা হয় কেন, হপ্তা ভোর তো চলা উচিত। অর্থাৎ হপ্তা ধরে এমনি মুনাফা পেটা যায় তা হলে।

আমার গ্রাম থেকেও সব এসেছে—নিতাই, বিভু এবং আরও অনেকে। এত কাছাকাছি এসেছেন, গ্রামটা একবার ঘুরে যেতে হবে দাদা। যাব তো নিশ্চয়ই, ওরা না বললেও যেতাম। আমার চিরকালের গ্রাম—একটুকু চোখে দেখে আসব। গরুর গাড়ি নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে ওরা—গরুর গাড়ি কেশবপুর রেখে এসেছে।

জীপে তেল ফুরাল। ছুটল একজন কেশবপুরে পেট্রোলের খালি টিন নিয়ে। সেই সেকালের ছেলেমানুষিতে আমাদের—পেয়ে বসেছে মটর-কলাইর ক্ষেতে ছুটে ছুটে গিয়ে এক গাদা করে তুলে আনছি, কাঁচা শুঁটি খেতে খেতে এগোচ্ছি পায়ে হেঁটে। কেশবপুর পৌঁছলাম, তখন রাত দুপুর। গরুর গাড়ি ফিরে গেছে রাতটা আমরা সাগরদাড়ি থেকে গেলাম এই রকম ধরে নিয়ে। তা হোক, সেই বয়সটায় ফিরে পেয়েছি কোন-কিছুতে দমতাম না যখন। একটা বাস যাচ্ছিল ওদিকে, রামভদ্রপুর-শ্মশানের ধারে তেমাথার উপর নামিয়ে দিয়ে গেল। আরও মাইল দুই। ঝাঁকড়া ডালপালা মেলে বিশাল বটগাছ আঁধার করে আছে জায়গাটা। গা ছমছম করে। আমার বাবার এবং কত আপন

মানুষের দেহ পুড়েছে ঐ শ্মশানে। জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছে, দিনমান ভেবে কাক ডেকে উঠল কোনদিকে। আমার ভারী স্যুটকেসটা নিতাই মাথায় তুলে নিল। ওরা বড়লোক—বিষম মান-প্রতিপত্তি এদিকে। কিন্তু রাত দুপুরে দেখছে কে? সেই কতকাল আগেকার মতো আমি বাড়ি যাচ্ছি।

বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। অতি-বৃদ্ধ নারিকেলগাছগুলো ঝিলমিল পাতা দোলাচ্ছে মাথার উপর। আমার পিতৃপুরুষের ভিটা। কিন্তু ঢুকব কেমন করে? উঠানে জঙ্গল—কাঁটাঝিটকে, ভাঁট, কালকাসুন্দে—তার মধ্যে মানুষ তলিয়ে যায়। এইখানে কুমীর-কুমীর খেলেছি ছোটবেলা; আমাদের বাড়ির নতুন বউরা পালকি থেকে নেমে আলতা-রাঙা পা রেখে এখানে দাঁড়াতেন। সেকেলে দালানকোঠা ভেঙে পড়ছে; নতুন দালানটা ঠিকই আছে। কিন্তু দু'পা গিয়েই বাপ-বাপ বলে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়িতে সাপের খোলস। ঘরের ভিতর কি অবস্থা, কে জানে? যাকগে—রাত্রিবেলাটা নিতাইর বাড়ি কাটানো যাক, কাল দিনমানে সাফসাফাই করে তখন এসে চাপা যাবে।

পুরানো কালের স্মৃতিগুলো কানের কাছে কথা কইছে। ঘুমুতে দেয় না। নিশি-পাওয়ার মতন চক্কোর দিতে বেরুলাম। টিপিটিপি চলেছি, আর কেউ টের না পায়। চতুর্দিকে মুসলমান বসতি—আমাদের গ্রামটুকুতে শুধুমাত্র হিন্দু। বর্ণ-হিন্দু যাঁদের বলেন, সবাই চলে গেছেন দু-এর ঘর ছাড়া। অদ্ভুত অবস্থা। গদখালির ভূতের গল্প আমাদের অঞ্চলে খুব চলতি। প্রথম যখন রেলগাড়ি ও ম্যালেরিয়া এলো, গদখালি গাঁয়ের সমস্ত লোক মরে ভূত-পেত্নী হয়ে রইল; বিদেশি জামাই রাত্রিবেলা শ্বশুরবাড়ি এসে নানান আজব ব্যাপার দেখে। আমারও সেই গতিক। একটা কাঁঠালগাছ এক হাত জায়গা সরিয়ে পুঁতবে—কী দাঙ্গাটা হয়ে গেল তাই নিয়ে!

ভুবন-পিসিমা কত যত্নে ঘর নিকোতেন, এক টিপ সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেত। ইন্দির বস্তুর দাওয়ায় সন্ধ্যার আগে দেখতাম, এক দঙ্গল ছেলেপুলে ভাত খেতে বসিয়ে দিয়েছে। ছেলেপুলে এত যে গুণতিতে পাওয়া মুশকিল; তাই সে বাড়ির নিয়ম ছিল, বেলা ন'টা লাগাত সব ক'টাকে পুকুর-ঘাটে নিয়ে গিয়ে একবার শৌচ করিয়ে দিত। সন্ধ্যার আগে আর একবার। বাচ্চারা ঠিক করে বলতে পারে না তো কে কখন স্বভাবের নিয়ম মান্য করে এসেছে—অধিক শৌচে দোষ নেই, সেজন্যে এই ব্যবস্থা। আজকে কোথায় চলে গেল সব! নাটার ঝোপে ঢেকে গেছে ইন্দির বস্তুর দাওয়া, ঢুকতে পারা যায় না···

ভাল করে সকাল না হতেই দরজায় ঘা দিচ্ছে। কে? ইউসুফ মিঞা খেজুররস এনেছে। রোদ উঠে গেলে রস গেঁজে ওঠে অনেক সময়, রাত থাকতে তাই পেড়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু রোদ উঠবার এখন দু-তিন ঘণ্টা বাকি—শীতের মধ্যে তুরতুর করে গাছের মাথায় কেন উঠতে গেলে মিঞা? ইউসুফ হাসেঃ এক দিনের তরে এসেছ—পয়সার জিনিষ নয়, পয়সা পাবই বা কোথা? একটুখানি গাছের রস, তা কি খারাপ জিনিষ মুখে এনে দেব?

আমি এসেছি, খবর পেলে কি করে?

বড় মামু সভায় গিয়ে দেখে এসেছিল। তারপরে তোমরা আমার দলিচঘরের পাশ দিয়ে আসছ, আমি সে সময়টা বাইরে এসেছিলাম এট্টু—

ব্যস, ইউসুফ মিঞা যে ঐ স্বচক্ষে দেখে খেজুর-রস দিয়ে গেল, তারপরে আর সামাল দেবে কে? দিনমানে নিজের বাড়ি এসে উঠেছি; একজন কাউকে বলব জঙ্গল কেটেকুটে দিতে, কোন-কিছুর দরকার হল না। মানুষ না লক্ষ্মী! মানুষের পায়ে পায়ে সাফসাফাই

হয়ে গেল। পুকুরনালা-ছেঁচা মাছ নিয়ে আসছে, ক্ষেতের তরি-তরকারি আনছে, গরু দুয়ে দুধ আনছে—আরে বাপু, এত জিনিষপত্র রান্না করবে কে? আর পেট তো আমার ঢাকাই জালা নয়।

সন্ধ্যার কাছাকাছি শেখপাড়ার একদল মেয়েপুরুষ এলেন। বিল-পারের গ্রাম থেকে এসেছেন। শেখেরা খুব সম্ভ্রান্ত, পাড়াগাঁ অঞ্চল হলেও মেয়েরা বাইরে আসেন না। এখন গরিব হয়ে পড়ায় পর্দার অবশ্য কড়াকড়ি নেই সে রকম—তবু বিল ভেঙে এসে উঠবেন, এতদূর ভাবতে পারা যায় না। মুড়ির মোয়া বানিয়ে নিয়ে এসেছেন; আর কিছু চিঁড়ে। ডালা ধরে আমার হাতে তুলে দিয়ে মাতব্বর পুরুষটি বললেন, নানান রাজ্যি ঘুরে এসেছ—শুনেছি, তুমি বাচ-বিচার করো না। মুড়ির মোয়া ক'টি খেও কিন্তু।

বললাম, মায়েরা আদর করে দিচ্ছেন—এ জিনিষ কোথায় পাব, কে দেয় আমাকে?

সবেমাত্র চা খেয়ে ফিরেছি পশ্চিম-বাড়ি থেকে। কত কাল পরে গাঁয়ে এসেছি, শুধুমাত্র চা নয়—বুঝতে পারছেন। তবু এঁদের সামনে পর পর গোটা দুই মোয়া তুলে মুখে ফেললাম। তুলতে গিয়ে দেখি, ডালার উপরে টাকা একটি।

টাকা কেন?

দিতে হয়। মনিব হলে যে তোমরা।

কেউ কারো মনিব নয়। নিয়ে নিন বলছি টাকাটা। টাকা বাদে আর সমস্ত মাথা পেতে নিচ্ছি আমি।

খাদু কবিরাজ লাঠি ঠুকঠুক করে এসে সজল চোখে বলল, কেন চলে গেলে বলো তো? আমরা কিছু করেছি? একটা ভারী কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কখনো?

ঘাড় নাড়ি: না, কোন দিনও না—

কেন তবে গেলে, আমাদের কোন্‌ দোষে? সাত পুরুষের ভিটে ছাড়তে মায়া লাগে না? আমাদের জন্য কষ্ট হয় না? লেখাপড়া শিখে গোল্লায় গেছ একেবারে তোমরা।

জবাব ছিল। কিন্তু সে কথা ব্যথাবিহ্বল অজ্ঞ গ্রাম্য চাষীকে কি বোঝাই? অপরাধীর মতন চুপ করে থাকি।

বলতে লাগল, দুর্গোৎসব হত ঐ মণ্ডপে; পুকুরের চারি পাড় জুড়ে ভাসানের বাজার বসত। ছেলেমানুষ তখন—হাঁড়িবাঁশি কিনে পোঁ-পোঁ করে বাজাতাম, আর কোঁচড়ে করে মুড়ি-বাতাসা খেতাম। আজকে সমস্ত গোরস্থান, শ্মশানঘাটা—চোখ তুলে চাওয়া যায় না। ফিরে এসো আবার তোমরা।

হাট জমেছে হাটখোলায়। এক দোকানে গিয়ে বসেছি। অশীতিপর এক বুড়ো এলেন। সাদা চুল, সাদা দাড়ি—এক গাছিও কালো নেই। রংটাও ফরশার দিকে। নৈমিষারণ্যের কোন ঋষি ভেবে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে। কথাবার্তাও খুব মিষ্টি। আমার বাবার নাম করে বললেন, অমুকের ছেলে তুমি? জেঠামশায়ের নাম করে বললেন, দু-জনে আমরা যশোর যেতাম মামলা করতে। বাঁধাঘাটের জঙ্গলে কেঁদোবাঘ বেরুত, এই বড় বড় ভালকো-বাঁশের লাঠি নিতাম কাঁধে। ফেরার পথে মণিরামপুর থেকে মোটা গলদা-চিংড়ি কিনে আনতাম। সে আকারের মাছ আজকালকার কেউ তোমরা চোখে দেখনি। কোথায় যেন সব উড়েপুড়ে গেল!

চাতরা আর আসাননগরের বিলের মাঝ দিয়ে পুরানো রাস্তা। সকালবেলা সেই দিকে বেড়াতে গিয়েছি। কালভার্ট (আমাদের অঞ্চলের দেশি নাম মরগা) ছিল দুই বিলের জল চলাচলের জন্য, সেকেলে খিলানের গাঁথনি—এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। পুরাণো ইট কিছু দেখতে পাওয়া যায় পাশের এক শুকনো নালার ভিতরে। মরগার কাছাকাছি এসে রাস্তাটাও অত্যন্ত সরু—বিলে নেমে গিয়ে

এপার-ওপার করতে হয়। চারো বুনছিল একজনে তালগাছের নিচে বসে। বলে, তোমার ঠাকুর্দা এই রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত গেল, এ-ও আর থাকবে কেন? আমরা সাধ্যমতো করছি—মাটি কেটে বছর বছর রাস্তায় দিই আমরা। মরগা নেই বলে এখান থেকে গরু নামিয়ে জল পার করে, গরুর খুরে নতুন মাটি ধ্বসে যায়।

এত টাকার মাটি দিতে পার—মরগাটা গাঁথতে কত খরচ হয় শুনি?

টাকার মাটি তো নয়, গতরের মাটি। গায়ে-গতরে ইট কেটেছি; পাঁজা সাজিয়ে পাড়ার তেঁতুল আর বাবলা গাছ কেটে পুড়িয়েও রেখেছি। গাঁথনির নগদ খরচটাই জুটছে না কেবল।

বাড়ি ফিরে দেখি, উঠানে মেলা বসে গেছে যেন। কাল যে একটুখানি হাটে গিয়ে বসেছিলাম, দূর-দূরন্তর অবধি চাউর হয়ে গেছে আমার আসার খবর। খালি হাতে আসে নি বড় কেউ—নিদেন পক্ষে দু-টুকরা পাটালি কি একটা হাঁসের ডিম। জঙ্গলে-ভরা পরিত্যক্ত আমাদের বাড়ির ভিতরে মানুষের চলাচল দেখে বর্তে গিয়েছে সকলে যেন। চেষ্টাচরিত্র করে সাধুভাষায় আমার সম্বন্ধে এমন সব বলছে, শুনে কান জ্বালা করে।

নিতাইকে বলি, যশোরের ফিরতি বাস কখন?

আজকেই যাবে দাদা? এই যে বলেছিলে থাকবে দু-চারদিন—

আগে বুঝতে পারিনি ভাই।

কিন্তু বিকালে মণিরামপুর তল্লাটের অনেক লোক যে আসবে! খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

দুপুরের মধ্যেই রওনা হতে হবে আমায়। উপায় নেই থাকবার।

গাঁ সুদ্ধ পালিয়েছে। আমিও পালিয়ে এলাম। ভর দুপুরে কাউকে না বলে-কয়ে—পালানো ছাড়া আর কি বলবেন? মস্ত দরের মানুষ হয়ে গেছি যে আমি! একদিন সকলের অতি-আপন ছিলাম, ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ হয়ে গিয়ে চাষীরা আমার দর বুঝতে শিখেছে। জিনিষপত্র নিয়ে অমন ভাবে দিবারাত্র ভিড় জমিয়ে থাকলে টিকব কেমন করে আমি?

যশোরের সেই কলমের দোকানের সামনেটায় ছাতা আড়াল দিয়ে সরে যাই। দেখতে পেলেই ডাকাডাকি করে চা খাওয়াবে—আমার জন্যে কলমটা আলাদা করে রেখেছে, সেটা বের করবে। বন্ধুজনে খুব নিন্দেমন্দ করলেন: গাঁয়ে-ঘরে গিয়ে লোকে কলাটা-মূলোটা টাকাটা-সিকেটা আদায় করে নিয়ে আসে—তুমি এমন বোকারাম, মাথার ঘাম ফেলে রোজগারের টাকা ওখানে রাস্তায় ঢালবার জন্য দিয়ে এলে?

(২)

যাব কাশ্মীর। পাঠানকোটের বাসের ভিতরে ঝুলতে ঝুলতে চলেছি। ঠোক্কর খাচ্ছি উঁচু-নিচু রাস্তায়, আর মনে মনে গরম হচ্ছি। কলকাতায় ফিরে এবার এক বিষম আন্দোলন শুরু করব। বাসে মহিলাদের বিশেষ আসন থাকে; ঐ রীতি পাল্টে লিখতে হবে—"পুরুষের জন্য"। কারো তরে যদি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকে, সে হল আমাদের পুরুষপক্ষের। মহিলাদেরও বলি, সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমরাই এতাবৎ শিভ্যালরি দেখিয়েছি, তাঁরা কিঞ্চিৎ এগিয়ে আসুন এবারে।

গোড়া থেকেই শুনুন তবে। অমৃতসরে দিন দুই কাটিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ, স্বর্ণমন্দির ইত্যাদি সমাধা করে ছুটতে ছুটতে

স্টেশনে এসে শুনি, সর্বনাশ—পাঠানকোটের গাড়ি ছেড়ে গেছে। এগারোটা বাজে স্টেশনের ঘড়িতে। ছেড়ে গেছে কি এখন? ঘণ্টা দেড়েক হতে চলল—এতক্ষণে আধাআধি পথ মেরে দিয়েছে। নতুন টাইম-টেবলে গাড়ি এগিয়ে দিয়েছে। নতুন লোক আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু অমৃতসর শহরে বিশ বছর যাঁরা হোটেল চালাচ্ছেন, খদ্দেরের পকেট ভারমুক্তই করবেন তাঁরা শুধু, অপর কোন উপকারে আসবেন না? ট্রেনের সময়টা অবধি জানা নেই। তা-ও যদি স্পষ্টাস্পষ্টি বলতেন—তা নয়, এমন ভাব দেখালেন যেন তাঁদের সঙ্গে হরবকত যুক্তি-পরামর্শ করে রেল-কোম্পানি তবে সময় ঠিক করে। একেবারে ঘণ্টা-মিনিট অবধি বলে দিলেন। ফলে আমার এই অবস্থা। ভেবেছেন বোধ হয়, বাক্স-বিছানা সহ আবার গিয়ে উঠব ওঁদের ডেরায়। এবং ডালের নামে হলুদ-বরণ জল, ভাতের নামে কাঁকর আস্ত-ছোলা ও বিশ-পঞ্চাশটা চালের দানা সিদ্ধ দিয়ে যথারীতি তিন মুদ্রা আদায় করবেন। আর এক বিদঘুটে কাণ্ড মশায়, পায়খানা পাঁচ-তলার চিলে-কোঠায়। হোটেল-বাড়িটা বলে নয়, গোটা শহর জুড়ে ঐ বনেদি রেওয়াজ। পাঞ্জাবি ভায়ারা যোদ্ধার জাত—বীরপদে দুমদুম করে উঠে যান। আমরা তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে এবং মিনিট তিনেক হাঁপিয়ে অশেষ অধ্যবসায়ে অবশেষে পাঁচতলার স্বর্গধামে পৌঁছই—তখন পা দু-খানা থরথর কম্পমান, আর কিছু নয়—যে-কোন স্থানে গড়িয়ে পড়বার বাঞ্ছা হয়। ক্ষীণজীবী কেউ কদাপি এ-সব বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারে, হেন সম্ভাবনা বাস্তুকারের মাথায় ঢোকে না।

মোটের উপর কানমলা খাচ্ছি, পাঠানকোট পায়ে হেঁটে যেতে হয়, সে-ও ভী আচ্ছা—ন্যাড়া মানুষ হয়ে হোটেলের ঐ বিল্ববৃক্ষ-তলে নৈব নৈব চ। তা পায়ে হাঁটার ঠিক আবশ্যক হল না,

টিকিট-বাবুটি হদিশ দিয়ে দিলেন, বাসের লাইন আছে। তবে খরচাটা বেশি। রেলের থার্ড ক্লাসের চেয়ে ছ-গণ্ডা পয়সা বেশি ভাড়া করে রেখেছে। বুঝে দেখুন এবারে।

উপায় নেই ছ-গণ্ডার মমতা ত্যাগ করা ছাড়া। এগারোটা বাজে, মাথায় রোদ চড়ে উঠেছে। পায়ে হাঁটায় নানা ঝামেলা। অদূরে বাস-স্ট্যাণ্ড। গাড়িও দেখা যাচ্ছে একটা। এবং অদৃষ্ট ভাল—মেয়েদের সিট ভরতি বটে, আমাদের এদিকে একটা বেঞ্চি অর্থাৎ দু-জনের জায়গা পুরোপুরি খালি রয়েছে। যাক বাবা, নিশ্চিন্ত!

কিন্তু তাই কি হবার জো আছে? জোর কদমে ছুটতে ছুটতে টাঙা এসে থামল। থামতে না থামতে তড়াক করে নেমে পড়ল একটা মেয়ে। মেয়ে বলতে যেমন কবিতাসিক্ত হয়ে ওঠেন, তেমনটি নয় কিন্তু। কালো চুলের বোঝার ভিতর একটা-দুটো পাকাও দেখা দিয়েছে, ঠাহর করলে বোঝা যাবে। তবে মুখখানা ভারি কচি। কুমারের প্রতিমা গড়ার মতো মুখটা যেন ছাঁচে গড়ে আলাদা করে বসিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে পুরুষ আছেন, তাঁর রূপ-বর্ণনায় হাঙ্গামা নেই। রোগা টিঙটিঙে আধ-বুড়ো মানুষটি। থপথপ করে যেন পা গুণে গুণে ভদ্রলোক মেয়েটার পিছন ধরেছেন।

ততক্ষণে মেয়েটা এসে ফড়ফড়িয়ে প্রশ্ন করে, পাঠানকোটের বাস এটাই তো?

হুঁ—

যাক, রক্ষে! ভেবেছিলাম ছেড়ে চলে গেছে।

ড্রাইভার জবাব দেয়, একটা সিট যে বাকি এখনো। যাবে নাকি? যাও তো এক্ষুণি ছাড়া যায়—

অর্থাৎ সর্বত্রই আমাদের কেশবপুর-লাইনের নিয়ম।

মেয়েটা বলে, দু-জন আমরা—

এক বেঞ্চিতে মা-মেয়ে পাশাপাশি বসে ছিল। বসে বসে অতিষ্ঠ হয়েছে। মা তাড়াতাড়ি পনের বছরের ধিঙ্গি মেয়েটাকে কোলের উপর তুলে জায়গা করে দিল।

মেয়েটা সেদিকে তাকিয়েও দেখে না। ঝুপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। ওঁরা যত্রতত্র বসতে পারেন, ওঁদের জায়গাতেই পুরুষের মানা। সঙ্গের লোকটা অগত্যা রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চললেন। রোগা শরীর—আহা, ঝাঁকুনির চোটে হাড়-মাংসের জোড় খুলে খুলে না পড়ে! অথচ অসুবিধাও কিছু ছিল না। আমার কাছে পুরুষকে বসিয়ে মেয়েলোক স্বচ্ছন্দে মেয়েদের মধ্যে বসে যেতে পারত।

রাস্তা বটে! এই স্বর্গধামে চড়লেন তো পরক্ষণে পাতালের অতল তলে। গাড়িসুদ্ধ মানুষ বসে বসেই তাণ্ডব নাচ নাচছি। একবার তো ধাক্কা খেয়ে পড়ল মেয়েটা আমার ঘাড়ের উপর। খিলখিল করে সেই তালে হাসি। কী গন্ধ মেখে এসেছে, বাস রে, নাকের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছে যায়।

একটু যখন সমান রাস্তা, বকবক করে গল্প জুড়ে দিল তারই মধ্যে। গল্প আর কি, বাঙালিদের জাত ধরে নির্জলা প্রশংসা। —যেমন চেহারা, তেমনি পোশাকআশাক ও চালচলন! কলকাতায় গিয়ে এক বাঙালি মেয়ের কাছ থেকে শাড়ি পরার কায়দা শিখে এসেছিলাম সেবার। তারই পছন্দ অনুযায়ী মার্কেট থেকে এক ডজন শাড়ি কিনেছিলাম। বাবুজী, কলকাতায় থাকেন তো আপনি? আহা ভারি ভাল জায়গা!

লেখাপড়া জানে, খাসা ইংরেজি বলছে। সেই জন্যেই বোধ করি জবড়জং ঐ গয়না ও কাপড়ের স্তূপগুলোর মধ্যে গিয়ে বসতে পারল না। আলাদা হয়ে তাই বসল এক বঙ্গবাসীর একেবারে

গা ঘেঁসে। হাত-আয়নাটা বাক্সর মধ্যে রয়ে গেছে—একটু দেখে নিতে পারলে হত। পথের কষ্টে ও মশার রক্তমোক্ষণে আমার চেহারায় খানিকটা বোধ করি পেলবতা এসেছে।

টলতে টলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ গাড়ি থেমে দাঁড়াল। ড্রাইভার হাঁকড়াচ্ছে, নেমে পড়ুন সকলে। কী কাণ্ড—ঝুলে-যাওয়া মানুষটির হাড়মাংস খুলে পড়বে, তার আগেই ইঞ্জিনের লোহার কলকব্জা খুলেঝুলে পড়ল নাকি?

তা নয়, নহর পড়েছে সামনে। রাভির জল এমনি সব পথে গমের ক্ষেতে নিয়ে যায়। নড়বড়ে এক পুল নহরের উপরে। সেটা মেরামত হচ্ছে। বড় বড় কাঠের খুঁটি ঠেকনো দিয়ে রেখেছে। বাস কায়ক্লেশে তার উপর দিয়ে যাবে—কিন্তু গতিকের কথা বলা যায় না, মানুষগুলো নামিয়ে দিচ্ছে। হেঁটে এইটুকু পার হয়ে আবার গাড়িতে উঠবেন।

নির্বিঘ্নে পুল পার হলাম বটে—বিপদ কিন্তু অন্যভাবে মুখিয়ে ছিল। মেয়েটার সঙ্গী লোকটা আগেভাগে উঠে আমার জায়গা জুড়ে বসেছে। কিছু বলতে যাবেন, তা অভয় ভঙ্গিতে মেয়েটা হাত বেড় দিয়ে রেখেছে তার বুকের উপর। আমার দিকে ঘাড় ঢুলিয়ে মুচকি হেসে আবদারের ভঙ্গিতে বলে, বাবুজী, আমার আমার স্বামী আমার পাশে একটু বসেছেন। আশা করি, তোমার আপত্তি নেই।

দেখুন দিকি, স্বামী স্ত্রীর পাশে বসবে—আমার কোন এক্তিয়ার আছে আপত্তি করবার? বিশেষ করে আমি বাঙালি—একটু আগে কান পেতে এত সুখ্যাতি যে-জাতের শুনলাম। অতএব স্বামী মহাশয়ের সেই রডখানাই এবারে আশ্রয় আমার। বুঝুন শয়তানি! পথের এই ভাঙা পুলের কথা জানা আছে, নামতে হবে সেখানে সকলের। তাই মহিলা-সিটে না গিয়ে আমার পাশে

বসে পড়ে আগে থাকতে মেয়েটা ঘাঁটি বানিয়ে রাখল। আজ্ঞে হ্যাঁ, জাত ধরেই বলছি—মেয়ে-জাতের উপর সাধে রাগ আমার! কিন্তু রেগেই বা কী করবেন কটমট করে একটু-আধটু তাকানো ছাড়া? সে কিন্তু দেখেও দেখে না। হয়তো বা হাসছে মুখ টিপে বাঙালি বাবুর বাদুড়-ঝোলা দশা দেখে। এবং ভ্রূক্ষেপ না করে জমিয়ে তুলল পাশের স্বামী লোকটার সঙ্গে। মুখ-চোখ নেড়ে গল্প করার সেই ভঙ্গিটা যদি দেখতেন!

কাশ্মীরের তিনটে পথ, রেল-লাইনও ছিল জম্মু অবধি। সমস্ত পাকিস্তানে পড়ে গেছে। এখন এই নতুন পথ বানানো হয়েছে—পাঠানকোট হয়ে যাওয়া। দেদার মিলিটারি ছাউনি, গৃহস্থবাড়ি কালভদ্রে এক-আধটা—এই হল পাঠানকোট। রেল-স্টেশনের লাগোয়া মাঠে কাশ্মীরের যত বাস এসে জমে। পাঞ্জাবি প্রাইভেট বাসের ভাড়া কম। কিন্তু পাহাড়ের উপর দিয়ে কখন কী কায়দায় চালাবে—তার চেয়ে টুরিস্ট-গাড়ি নেবেন। খরচ কিছু বেশি হলেও প্রাণ নিয়ে পৌঁছতে পারবেন, আশা করা যায়।

শোনা ছিল, বাসওয়ালারা ছেঁকে এসে ধরে, হাতের বোঁচকা চিলের মতন ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে যায়। এ তো দেখছি ফাঁকা মাঠ। ট্রেন অনেক আগে এসেছে; ট্রেনের যাত্রী নিয়ে বাস সব বেরিয়ে গেছে। গড়িমসির উপায়ও নেই—সন্ধ্যা হয়ে গেলে জম্মু থেকে গাড়ি আর এগুতে দেয় না, বেলাবেলি তাই জম্মুর পুল পার হওয়ার গরজ। একটা বাস কেবল অর্ধেক ভরতি হয়ে আছে। লোক পেলে যাবে, নয়তো নামিয়ে দেবে যে ক'জন চড়ে বসে আছে। আর কোণের দিকে ঐ স্টেশন-ওয়াগন ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর-ইঞ্জিন সবসুদ্ধ দিব্যি আরামে অঘোর ঘুম ঘুমুচ্ছে।

রে-রে—করে সহযাত্রীরা বাসের দিকে ছুটল। গয়না ঝমঝম করে বউগুলোও কিবা শজারুর মতন ছুটছে রে! সাধ্য কি

ভেতো বাঙালি মিলিটারি জাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব! বিস্তর কষ্টে অবশেষে কনুই ঠেলে যা-হোক করে উঠতে যাচ্ছি—সেই যে কন্যা পাশে বসে ধন্য করেছিলেন, মধুর হেসে তিনি বললেন, বসবেন কোথায় আপনি?

ঐ যে খালি জায়গা রয়েছে—

আমার স্বামীর জায়গা। দেখতে পাচ্ছেন না তাঁর টুপি?

গোটা স্বামীকে ছুটিয়ে আনতে পারেনি, তাঁর মাথার টুপিটা খুলে এনে সিটে রেখেছে। সে-ভদ্রলোক থপথপ এসে পৌঁছুতে হাত ধরে টেনে তুলে নিল। আমায় বলে, নেমে যান। ওদিকটা তো দাঁড়িয়ে এলেন—কিন্তু পাহাড়ে উঠবে, এখন দাঁড়াতে দেবে না। স্টেশন-ওয়াগনকে বলে দেখুন বরঞ্চ। আর নয়তো একটা রাত শুয়ে বসে কাটিয়ে দিনগে স্টেশনে। কাল যাবেন। শ্রীনগর তো একদিনে উড়ে পালাচ্ছে না—

পরম আপ্যায়িত হয়ে নেমে এলাম। গর্জন উঠল ইঞ্জিনে; ধুলোর ঝড় উড়িয়ে পিছনের নলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গাড়ি দৌড়ল।

এখন কি করবেন? স্টেশন-ওয়াগনের ঘুম ভাঙাতে যাবেন, না ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে—সেইটের সামাল দেবেন সকলের আগে? ইতিমধ্যে আর এক সমস্যা জুটেছে। সিগারেটের দোকানের আয়নায় হঠাৎ একবার নজর পড়ে গেল। সে-নজর ফেরাতে পারিনে। চিরকাল নিজেকে মসীকৃষ্ণ বলে জানি—দেখলাম, আয়নার মধ্যে রীতিমত এক গৌরবর্ণ পুরুষ। বড় দুঃখ, এমন ভুবন-মোহন রং চিরস্থায়ী করে রাখা যাবে না; জল পড়লেই ধুয়ে যাবে। নশ্বর বস্তুর উপর মমতা বাড়ানো ঠিক নয়—স্নান সেরে ধুলো ধুয়ে তবে আদি-বর্ণই বের করা যাক, কি বলেন?

এই সব ভাবছি—হেন কালে দেখি, কোন দিক দিয়ে দু-জন এসে আমার একটা কাজ সেরে দিল। হাঁকডাক করে জাগিয়ে তুলল স্টেশন-ওয়াগনের ড্রাইভারকে।

আগে কতগুলো গাড়ি গেছে?

বার-চোদ্দটা—

মেয়ে গিয়েছেন একজন?

লোক দু'টির মধ্যে একের লম্বা চুলে বাহারের টেড়ি; অপরটি বওয়ামর্ক গোছের। জিজ্ঞাসা করে, ঠিক করে বলো। এক্ষুণি তবে রওনা হতে হবে। পুরো গাড়ির ভাড়া দেব। আমাদের সর্বনাশ করে যাচ্ছেন মেয়েটা—

হাতে বালা-পরা শিখ ড্রাইভার বলে, একটা বলে কি—দেড় দুই ডজন গেছে। আওরত আজকাল খুব যাওয়া-আসা করে।

দেশসুদ্ধ আওরতের কে খবর চাচ্ছে? আমরা যাঁকে চাই—

টেড়িওয়ালা জোগান দেয়, দেবীর মতন চেহারা। চোখে-মুখে কথা বলেন।

ড্রাইভার গম্ভীর হয়ে ঘাড় নাড়ে, ঠিক—

সঙ্গে লোক আছে?

হুঁ—

কী রকম লোক বলো দিকি?

ঘন ভ্রূর আড়ালে ড্রাইভার চোখ পিটপিট করে বলে, চশমা-পরা হাওয়াই কামিজ-গায়ে কমবয়সি ফুটফুটে একজন—

টেড়িওয়ালা নিশ্বাস ফেলে বলে, কমবয়সি হলে ভাবনার কী ছিল? আমাদের যা হবার হোক, দিদির তো ভাল হল! এ নয় ড্রাইভার সাহেব, তুমি আর কোন মেয়ের কথা বলছ।

ড্রাইভার মজা পেয়ে থাকবে কথাবার্তায়। ইতস্তত করে বলল, তবে বুড়ো লোকই হবে। আজকাল কি হয়েছে—শরমের

বাত নেই, খাপসুরত আওরত দেখলেই বাচ্চাবুড়ো সবাই পিছু নেয়।

জেরা শুরু হল যণ্ডামর্ক লোকটির।

তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে, দেখলে কি করে, হ্যাঁ?

ড্রাইভার চটে গেল: যায় তো এমনি! এতকাল গাড়ি চালাচ্ছি, আমাদের কি দেখে বলতে হবে? জোড়া বেঁধে পাহাড়ে ছোটে একটি-দু'টি নয়—

তা সে পুষ্পদেবী না-ও হতে পারে।

পারেই তো! নামধাম তো জিজ্ঞাসা করে রাখিনি—আলবৎ পারে।

রাগ করে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এই রে: পাকা-গুটি কেঁচে যায় বুঝি! ছুটে কাছে চলে যাই: হ্যাঁ মশায়, তারাই। একসঙ্গে এসেছি আমরা অমৃতসর থেকে। তারা চলে গেল, আমায় জায়গা দিল না।

সন্দেহের বাষ্পটুকুও থাকতে দেব না, জোর দিয়ে আবার বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, মহিলাটি পুষ্পই বটেন। আর সঙ্গে আছেন যিনি—কালো টুপি আর আচকান-পরা। নামটা হলগে—হলগে—

টেড়িওয়ালা বলে দেয়, মহেশ্বর দয়াল। অডিট অফিসে কাজ করেন।

তাই বটে, তাই বটে! যোগ-বিয়োগের কথাই হচ্ছিল—অডিটর নিশ্চয়।

জয় মা কালী, এদের এই খোঁজের আসামি হয় যেন সেই দুটো। বেঘোরে ফেলে চলে গেল, জাতক্রোধ রয়েছে—তাদের শখের যাত্রা ভেঙে-চুরে দিয়ে পরম আরাম পাব। আর নিতান্ত না-ই যদি হয়, আমার লোকসান কি? যাওয়া তো হোক ওদের খরচায় শ্রীনগর অবধি!

কি রকম দেখলে বলো দিকি—কি বলাবলি করছিল? শুধুই অঙ্ক?

বেশি বলবার তাগত থাকে ঐ অবস্থায়? বলুন না—বলা কি আসে?

ষণ্ডামর্ক আগুন হয়ে উঠে টেড়িওয়ালাকে বলে, বিদ্যেধরী দিদি তোমার। অঙ্কে ঝুনো-মাথা চাচা সাহেবের—সেই মাথা অবধি তালগোল পাকিয়ে দিল। দেখ, ফেরাতে যদি না পারি সগোষ্ঠী গিয়ে চাপব তোমাদের কাঁধে। খাওয়াতে পরাতে হবে।

টেড়িওয়ালা বলে, তা বই কি! খাওয়া-পরা তোমরাই তো জোগাবে আমাদের। এতগুলো ভাইবোনের মধ্যে দিদিই শুধু লেখাপড়া শিখলেন। কাজ ছাড়িয়ে তাঁকে নিয়ে পালাল—খুড়োর পাপে ভাইপোর দায়িত্ব অর্শায় কিনা বল।

দু-জনে ড্রাইভারের পাশে রয়েছে, আমি পিছন দিকে। অবিরত এমনি বকর-বকর ও বচসা চলেছে। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে এক-আধটা প্রশ্ন আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। মনে-মনে আমি গুরুর নাম জপছি। ভালয় ভালয় গিয়ে নামতে পারলে যে হয় শ্রীনগরে! সেখানে যদি ঐ জোড়া ফৌত হয়ে গিয়ে থাকে, আমি তার কি করব?

পথ বড় ভাল। বর্ণনায় সুখ পাবেন না—ইচ্ছে হয়, ঘুরে আসুন না পাঠানকোট থেকে। কুড়ি টাকা ভাড়া তো মোটে!

হু-হু করে ছুটেছি। কিন্তু কাস্টমসের আড়গড়া অনতিপরেই। সে আবার দু-তরফে। একবার এঁদের, একবার কাশ্মীর এলাকার। একই ভারত তো বাপু—এমন কড়াকড়ি কি জন্যে তবে?

গাড়ি পড়ে আছে পথের ধারে, কাস্টমসের হুজুররা আর বেরোন না। সবাই ব্যস্ত হচ্ছি, কি হল? রাত হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দাও রে বাপু—

এলে কেন এমন অসময়ে? সবগুলো বাস ছাড় করে দিয়ে কর্তারা একটু কামরায় ঢুকেছেন। একবার ঢুকে পড়লে বের করে আনা সোজা?

তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিক দেখছি। রাস্তা তড়িঘড়ি বানানো মিলিটারি ব্যবস্থায়। পাহাড় কেটে চৌরস করে, নিচু জায়গায় মাটি তুলে পাহাড় বানিয়ে, খাল-নদীর উপর পুল বেঁধে। পাঠান-কোট থেকে টেনে-হিঁচড়ে জম্মু অবধি নিয়ে সাবেক রাস্তার গায়ে মিশিয়ে দিয়েছে।

বুনো-ডালিমের চারা—দেখুন দেখুন, আপনা-আপনি ফলে আছে পাহাড়ের খাঁজে। বেঁটে গাছে কেমন ছোট্ট ছোট্ট ফল। চলতি গাড়ির রেলিঙের ফাঁকে হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছি। বেশ তো মিষ্টি!

অবশেষে দোকানপাট দেখা দিচ্ছে। নদীর দু-পারেই জম্মু। ডাক বাংলো এবং রাজবাড়ি ইত্যাদি পার হয়ে গিয়ে গাড়ি একটুখানি দাঁড়িয়েছে, ইঞ্জিনে জল টগবগ করছে। খাবার দোকান অদূরে। সটান সেদিকে চললাম। ভাজাভুজি বানাচ্ছে, ভুরভুরে গন্ধ বেরিয়েছে। কাস্টমস কড়াকড়ির একটা গুণ দেখলাম, ভেজিটেবল ঘিয়ের এ-রাজ্যে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। শৈশবকালে ঘৃত নামে এক খাদ্যবস্তু ছিল, তারই পুরোপুরি চলন।

কিন্তু হবার জো আছে? ওদের কথাবার্তা শুনছি—কাকে যেন জিজ্ঞাসা করছে, আগে যত বাস এসেছিল, বেরিয়ে গেছে?

কখন!

কতক্ষণ গেছে?

দু-পাঁচ ঘণ্টা হবে—

দু-ঘণ্টা যা, পাঁচ ঘণ্টাও তাই—উত্তরদাতার কাছে। ওরা পাগল

হয়ে উঠল, আসুন, উঠে আসুন। আহা, কি করছেন ঐখানটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

নড়ছি না তো ছুটে এসে পড়েছে যণ্ডামর্ক ছোকরা।

যাবেন কি যাবেন না, সেইটে বলে দিন। দু-হাতে টাকা ছড়াচ্ছি। আপনার হল ষোলআনা মুফতে যাওয়া, তাই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খাওয়ার পুলক আসে।

রাগ হয়ে যায় ঃ আমি তবে রয়ে গেলাম মশায়—

তা বই কি! আপনার কথার উপরে যাচ্ছি। এখানে হল না তো কুদে গিয়ে ঠিক তাদের ধরব। তখন ভজিয়ে দিতে হবে। ভাঁওতা দিয়ে থাকেন তো সহজে রেহাই পাবেন না। সে তখন বুঝতে পারবেন।

কে যায় ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে, আবার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যা হল, রাত্রি হল। আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটেছি। জঙ্গলের মধ্যে এই একটা আলো, উই একটা। পাহাড়িয়াদের ঘর। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এক এক সময়। উঃ, কত উঁচুতে এখন! বুকের মধ্যে গুরগুর করে। এত জোরে চলেছে গাড়ি—হাতখানেক ওধারে সরলেই গেছি আর কি! বিশ-ত্রিশ পাক খেয়ে গড়াতে গড়াতে গাড়ি ও আমরা তালগোল পাকিয়ে কোন্ গিরিকন্দরে গিয়ে পড়ব। এতেও ওরা খুশি নয়—ক্রমাগত হাঁক পাড়ছে, জোরে—আরও জোরে--

অনেক রাতে কুদ পৌঁছলাম। বড় শীত। আগের বাসগুলো গাছের ছায়ায় গুটিসুঁটি হয়ে আছে। অন্ধকারে ঝাপসা-ঝাপসা দেখছি। গিরিরাজ বাঁ-দিকটায় আকাশের তারা অবধি মাথা তুলে নিঃশব্দ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ডান দিক একেবারে ফাঁকা। পাহাড় পাতাল অবধি নেমে গেছে। ঝরনার আওয়াজ আসছে বনান্তরাল থেকে।

গাড়ি দাঁড়াতেই জন তিন-চার উপর থেকে ছুড়দাড় করে নেমে এল।

ঘর চাই তো? খুব ভাল ঘর—চার পাশ দেয়ালে আঁটা, শীত হবে না। চার আনা করে সিট, খাটিয়া চান তো আরও ছ আনা। সারা রাত্তির আলো জ্বলবে—আলো ফ্রী।

এই শীতে আকাশের নিচে কাটানো যাবে না, ঘর অতএব চাই-ই। হ্যারিকেন ধরে তারা উপরে নিয়ে চলল।

এই যে, এদিকেই বাপু কত ঘর রয়েছে। আর কত উঠব? এরই একটায় দিয়ে দাও না।

আগের লোকে নিয়ে নিয়েছে। এর উপরের থাকও ভরতি। তার উপরে গিয়ে পাবেন।

পাহাড়ের গায়ে খানিক খানিক জায়গা চৌরস করে ঘরবাড়ি তুলেছে। ধাপে ধাপে এমনি উঠে গেছে। সেই উপরের ধাপ ছেড়ে আবার উপরে গিয়ে ঘর পেলাম। আমাদের উঠোন আর নিচেকার ঘরের ছাদ এক লেবেলে। আমাদের উপরেও ঠিক এমনি। কাঁধের বোঁচকা নামিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল রে বাপু!

সঙ্গী দু-জন কর্মবীর মানুষ। সবুর সয় না, সঙ্গে সঙ্গে আসামি খুঁজতে বেরুল। টেড়িওয়ালার বুঝি একটু আলস্য ধরেছে—যাচ্ছে তবু তারই মধ্যে বলে, কোথায় গিয়ে সেঁদিয়েছে, কাঁহাতক দুয়োর ঠেলে ঠেলে বেড়াব? ভোরবেলা বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ান যাবে। যাবে তো কোন-না-কোনটায়। ফোঁটা দুই চোখের জল, ব্যস— দিদি গলে জল হয়ে যাবে। দিদির মতন মানুষ হয় না, মন ওর বড্ড নরম।

আমার চাচা সাহেব আরো ভাল। দেবতা, দেবতা— কুহকিনীর ফেরে পড়ে আজ এই দশা। বুকে থাবা মেরে যণ্ডামর্ক বলতে লাগল, আমার ওসব নয়, কান্নাকান্নির তালে যেতে হবে

না আমায়। ভক্তি করে পা ছুঁতে গেলে চাচা কি রকম তিড়িং করে উঠবে দেখো। সুড়সুড় করে পিছন পিছন আসবে। ভয় আছে—তুই পা জাপটে ধরে মাথা খুঁড়তে লাগলে তখন কি হবে?

ভক্তিমান ভাই ও ভাইপো বেরিয়ে পড়ল। বাড়িওয়ালাও ঘর দেখিয়ে দিয়ে আবার নিচে নেমে গেছে। মেজের উপর ইতিমধ্যেই অনেক বিছানা। তারই একটার প্রান্তে বোঁচকাটা গচ্ছিত রেখে আমিও বেরুলাম। শোবার ব্যবস্থা হল, কিন্তু মুখে কিছু দেওয়ার দরকার। অমৃতসরের পরে আর ও-পাট হয়নি। জলের আওয়াজ আন্দাজ করে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি। একটু বাঁক ঘুরেই, কী আশ্চর্য, এত কাছে ঝরনা! নিচের দিকে—একেবারে পায়ের নিচে বলতে পারা যায়—টিমটিমে আলো কয়েকটা। ঝরনা দু-ভাগ হয়ে গেছে এখানটায়। ঝরঝর ঝরঝর মিষ্টি সুরে পাথরের উপর জল আছড়ে পড়ছে। একেবারে কিনারে এসে পড়েছি, জলের ছিটে এসে লাগছে গায়ে।

একটা লোক জলের বালতি নিয়ে পাথরের খাঁজে পা রেখে নামছে। পিছু নিলাম তার। খানিকটা নেমে আর অসুবিধা নেই। নিচের আলো এসে পড়েছে। সঙ্কীর্ণ যদিচ, চলাচলের পথ আছে দিব্যি।

লোকটির নজর পড়েছে। পিছন দিকে ভ্রূকুটি-দৃষ্টিতে তাকাল একবার। আমি তাড়াতাড়ি বলি, বাসে এসে পৌঁছেছি। হোটেল-টোটেল কোন দিকে বল তো?

হুঁ—বাস বুঝি পাহাড়ের মাথার উপরে এনে তুলে দিল? একা এসেছ, সাথে-সঙ্গে কেউ নেই বুঝি?

ভেবেছে কি লোকটা? চোর-ছ্যাঁচোড় অন্ধকারে মতলব নিয়ে ঘুরছি, এমনি কিছু?

মুখ ফিরিয়ে লোকটা আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, টাকা-পয়সা আছে, না ফকির সেজে মাংনা খাবার ফিকিরে আছ ?

জবাব কি দেব বলুন ? বলি যে আছে টাকা-পয়সা, আর দৈত্য সম লোকটা হাতের বালতি নামিয়ে রেখে জনহীন এই পর্বত-সানুতে কঁ্যাক করে ধরুক টুঁটি টিপে ! ঝামেলায় কাজ নেই— যেমন যাচ্ছে নেমে যাক অমনি। গেলও তাই খানিক দূর। তারপরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, হোটেল নেই এ-জায়গায়— ঐ আমাদের খাবারের দোকান। পয়সা লাগবে কিন্তু।

দোকান পাঁচ-ছ'টা। দোকানেরই আলো দেখছিলাম উপর থেকে। ঝরনার একেবারে লাগোয়া। কিন্তু জল এখানে অনেকটা নিচে। তাই উপরে উঠে জল ধরে আনতে হয়।

এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করি, ভাত মিলবে ?

হি-হি হো-হো করে চতুর্দিক থেকে হেসেই খুন। বলে, কাণ্ড দেখ ! ভাত-ভাত করছে ডাল-ভাত খাওয়া বাঙালিবাবু। বলি, ভাত খেতে যাবে কেন ? ভাল ভাল জিনিস আছে—পুরি, কচুরি, বরফি, হালুয়া—

তা হোক, হাসো আর যাই কর, ভাত আমার চাট্টি চাই-ই। কাল তুপুরের পর ও-বস্তু পেটে পড়েনি। রাত্রে এক শালের আড়তদার নিমন্ত্রণ করেছিলেন—ঐসব ভাল ভাল বস্তু তখন বিস্তর ঢুকিয়েছি। এবং তারই উদ্গারে সকালের খাওয়াটাও গেছে। ভাত না হলে মারা পড়ব।

একজনে অবশেষে সদয় হয়ে বলে দিল, ভাত খাবে তো ডাক-বাংলোয় যাও। বাবুর্চি আছে—ভাত আর জবাই-মুরগি রসুই করে রাখে। থুঃ থুঃ—

অখাদ্য-কুখাদ্যের নাম বলে ফেলে লোকটা থুতু ফেলল মুখ বাঁকিয়ে

ডাকবাংলো কেন, আমার যা অবস্থা—যমালয়ের ঠিকানা দিলেও গোস্ত-ভাতের লোভে সেই অবধি যেতে রাজি আছি। তা সেই রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে-ভরা পাহাড়ের অন্ধিসন্ধি বেয়ে খুঁজে পেতে যথাস্থানে পৌঁছুতে যে বেগ পেতে হল, যমালয় তার চেয়ে বেশি দুর্গম মনে হয় না।

বারাণ্ডায় উঠে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—আরে আরে, অজিত সিং যে!

আপনি এখানে মাস্টার মশায়?

কাশ্মীর যাচ্ছি—

এটাও তো কাশ্মীর। কখন এসে পৌঁছলেন, উঠেছেন কোথা?

মোটামুটি পরিচয় দিলাম। ঝরনা যেখানটায় দুই ভাগ হয়ে বেরিয়েছে, তার একটু পশ্চিমে—

মাস্টারি জীবনের গোড়ার দিককার ছাত্র এই অজিত। পয়লা দিনই খুব এক মজা হয়েছিল পুষ্টগুম্ফ ছাত্রটিকে নিয়ে। সে এক ভিন্ন গল্প, আর এক সময় হবে। জিরাণ্ডিয়াল-ইনফিনিটিভ আর ভারব্যাল-নাউনের তফাৎটা কিছুতে রপ্ত করতে পারে না, ঐ এক বাবদে কত যে পিটুনি খেয়েছে লেখাজোখা নেই। এবং ঐ গ্রামারের আতঙ্কেই শেষ অবধি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল শিখের বাচ্চা হয়েও। সেই অজিত জলের মতন ইংরেজি বলে যাচ্ছে, ইংরেজির মাস্টার আজ থই পায় না ছাত্রের কথার তোড়ে।

বলে, আট বছর আছি এই কাশ্মীরে পড়ে। হদ্দমুদ্দ দেখা হল। লোকে এসে কী যে দেখে এখানে! মিলিটারি গাড়ি চালাই, ফ্রণ্ট অবধি গতিবিধি। আপনাদের সেখানে যেতে দেবে না। কোন গতিকে জোড়তালি দিয়ে রাস্তা বানানো—রাত্রিবেলা আমি কিন্তু চোখ বুঁজে তার উপর দিয়ে চলে যাই।

কথা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এখন কোথায় যাচ্ছ?

জিভ কেটে অজিত বলল, এ সব কখনো জিজ্ঞাসা করতে আছে ? যান তো বলুন, জীপে করে ভোরের আগে পাঠানকোট পৌঁছে দেব।

না বাপু, আমি তো উঠছি সবে। এখন ফিরতে যাব কেন ?

বারাণ্ডায় কথা হচ্ছিল। পাশের ঘর দেখিয়ে অজিত বলে, ঐখানে আছি। খাওয়ার পরে আসবেন না একটু। কতদিন পরে দেখা—

খানাঘরে গিয়ে ফরমায়েস করি, ভাত খাওয়াতে হবে কিন্তু।

ক-জন ?

এই একা, একটি প্রাণী—

বাবুর্চি হেসে বলে, কথা শুনে মনে হল বিশ-পঁচিশজন এসেছেন বুঝি দল বেঁধে।

খানসামাকে বলে, কারি নিয়ে আয়। আর ভাত।

নিয়ে এল প্লেটে করে আলু-কপির ঘ্যাঁট। আর তেল-মাখা বাটি দেখে থাকেন তো—সেই মাপের ভাত চাট্টি এক পাশে।

কপির কারি নাকি হে মিঞা ?

বাবুর্চি বলে, গোস্ত পড়েনি পাতে ? তা হতে পারে, খেয়েদেয়ে ফুরিয়ে ফেলেছে। মুখে দিয়ে দেখুন না, গোস্তর স্বাদ পাবেন।

তাই বোধ হয় হবে। সারা দিনের ধকলে জিভ শুকিয়ে অসাড় হয়ে গেছে, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। বললাম, সে যাক গে। আর চাট্টি ভাত নিয়ে এস। যে ক'টি দিয়েছিলে, সে তো দাঁতের ফাঁকে ঢুকে গেল, পেট অবধি পৌঁছল না।

বাবুর্চি ও খানসামার মধ্যে মৃদুকণ্ঠে কিছু কথাবার্তা হল। শেষটা অম্লান বদনে বলে, ভাত নেই। রাত দুপুরে হাঁড়ি-ভরতি ভাত নিয়ে কে বসে থাকে বলুন ? ঐ যা ছিল দিয়ে দিয়েছে ?

কিছুই নেই, তবে বসালে কেন ভাতের নাম করে?

লোকটিও সমান তেজে জবাব দেয়, বসিয়েছি বলে যে এক কাঠা চালের ভাত দিতে হবে এমন চুক্তিপত্রে সই হয় নি বাবু। ভদ্রলোক কম খায় এই জানা ছিল—সেই ভরসায় বসিয়েছি। কী রকম ভদ্রলোক!

আপনমনে খানিক গজর-গজর করে বলে, যাকগে বাবু, ঝামেলা করতে পারিনে। আড়াই টাকা রেট—সেইটে দিয়ে দিন। আমি হিসেব ঠিক করে ফেলি। তারপর সারা রাত্তির ধরে আপনি খান কিংবা যা ইচ্ছে করুন।

টাকা নিয়ে হিসেব ঠিক করতে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ নজরে পড়ে, কোণের দিকে আধ-অন্ধকার ছোট টেবিলটায়—হাঁ, তারাই তো, সেই আসামিযুগল। সারা পথ দাঁড় করিয়ে এনেছে অমৃতসর থেকে, পাঠানকোটে একাকী ফেলে এসেছে। সে-রাগ তো আছেই—আর এই পেটে না খেয়ে আড়াই টাকা গচ্চা দেওয়া, তারও আক্রোশ পড়ল মেয়েটার উপর। সকাল সকাল এসে পৌঁছতে পারলে কি এই দুর্গতি হত?

বাংলোয় ঘর পেয়ে গেছেন? বেশ, বেশ। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি শ্রীদয়াল। ওদিককার ঐ যত টিনের ঘর, অতি যাচ্ছে-তাই জায়গা। ওখানে থাকতে হলে পুষ্প দেবীর কষ্ট হত।

দু-জনে হতভম্ব হয়ে তাকায়: আমাদের চেনেন আপনি?

ডিটেকটিভের ঢঙে রহস্যময় হাসি হেসে বলি, কনট-সার্কাসে ওঁর অফিসে কত ভাল ভাল ফার্মের অডিট হয়, আর কন্যা-বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা আপনি পুষ্প দেবী—না-চেনবার কেউ আপনারা নন।

দিল্লি থাকেন আপনি?

এইবার এই আসার পথে দুটো দিন ছিলাম।

তারপর ধীরে ধীরে রহস্য উন্মোচন করছি : আপনাদের নামেই চেনা উচিত ছিল। সেটা হয় নি। আজকে এই একসঙ্গে আসতে আসতে আপনার ভাই আর দয়াল মশায়ের ভাইপোর মুখে যাবতীয় ব্যাপার শুনলাম।

লক্ষ্য করছি, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে পুষ্পর মুখ। অস্ত্র হানতে তবু মায়া হল না। বললাম, আছেন তাঁরা এখানে। আপনাদের জন্যই এসেছেন। ভোরবেলা বাসস্ট্যাণ্ডে কাল দেখা হয়ে যাবে।

পুষ্প বলে ওঠে, হোকগে দেখা। যেখানে খুশি চলে যাব আমরা। কার কোন ধার ধারি? ভয় করে চলি কাউকে?

শান্তকণ্ঠে বলি, ওঁরাও ভয় দেখাতে আসেন নি। আশ্রিত প্রতিপাল্য ওঁরা—ভয়ের কথা ওঠে কিসে? আপনার ভাই হাউ-মাউ করে কাঁদবে, আর ওঁর ভাইপো দু-পা জাপটে ধরবে—সেই সব যুক্তি-পরামর্শ হচ্ছিল।

পুষ্প মহেশ্বরকে বলে, শুনলে তো? একটু দয়ামায়া নেই। চিরকাল ওদের বোঝা টেনে বেড়াব, নিজেদের সুখ-শান্তি দেখব না। লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দেবে, বুঝলে তো, কাল যখন তোমার পা ধরতে আসবে।

সে যেমন হোক করবেন—আপনাদের নিজেদের ব্যাপার। বিয়েটা হয়ে গেছে না হয়নি এখনো—সেই সব ওঁরা বলাবলি করছিলেন। আমি বললাম, হয়েছে নিশ্চয়, নয়তো কক্ষণো স্বামী পরিচয় দিতেন না।

পুষ্প আগুন হয়ে বলল, হোক চাই না হোক, তাদের কি যায় আসে? তারা কি গার্জেন আমাদের?

হয়ে থাকলে আমোদ-ফূর্তি করবে, না হলে ঘটিয়ে দেবে তাড়াতাড়ি। এই তো মনে হল কথাবার্তার ধরনে।

ওষুধ ধরিয়ে দিয়ে অজিত সিংয়ের ঘরে গিয়ে দুটো-পাঁচটা

কথা বলে পরমানন্দে বাসায় চললাম। ক্লান্ত। চাঁদ উঠেছে কখন। শান্ত বনস্থলী জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবে আছে। ঝরনার ধারে এসে পা আর চলতে চায় না। জল নয়, আকাশ থেকে থেকে গলা-জ্যোৎস্না ধারা হয়ে পড়ছে যেন। দিগ্‌ব্যাপ্ত জ্যোৎস্না জীবন্ত হয়ে লাফালাফি করছে পাথরে পাথরে, গান গাইছে অশ্রান্ত একটানা সুরে। গায়ে ওভারকোট, পায়ে পশমি মোজা, হাতে দস্তানা—এক পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। সমস্ত ভুলে ছিলাম—এই কলকাতা শহর, শহরে আপন-জন বলে যাদের পরিচয় দিয়ে থাকি, সমস্ত ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মন থেকে। আমি আর হিমালয় আর আকাশের চাঁদ, আর ঝরনার অবিরল ধারা।

কতক্ষণ কেটেছে জানিনে। মানুষের পায়ের শব্দে চমকে উঠি।

কে, কে তুমি ?

আস্তে। ওরা তো ঐ কাছেই আছে। আসা উচিত নয়, তবু এসেছি। আপনি নিচের দিকে আসুন একটু।

ভয়-ভয় করছে। নিশি রাত্রি, নির্জন পাহাড়। ঘণ্টা বারো-চোদ্দ আগেও একেবারে অজানা পুষ্প মেয়েটা ডাকছে আমাকে। সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথে জঙ্গলের মধ্যে যাব কোথায় তার সঙ্গে ?

হঠাৎ আমার হাত জড়িয়ে ধরে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, বাঁচান আমাদের—

অবাক হয়ে যাই। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, মারছে কে আপনাদের যে বাঁচাতে হবে ? আর আমার ক্ষমতাই বা কি ?

পুষ্প বলে, মারতে এলে তো রক্ষে পেতাম। পাল্টা জবাব ছিল তার। খবর তো আপনিই দিলেন—মারামারি করবে না, হাপুস-নয়নে কাঁদবে, পায়ে পড়বে।

অপরিচিত পুরুষের কাছে সব কথা বলা সহজ নয়। আজ নাকি একেবারে নিরুপায়। একটু চুপ করে থেকে মনের দ্বিধা জোর করে ঝেড়ে ফেলে পুষ্প বলতে লাগল, খুলেই বলি, বিয়ে হয়নি এখনো আমাদের—বিয়ের জন্য পালিয়ে যাচ্ছি। মনে-মনে হাসছেন, বয়স কাটিয়ে দিয়ে এতকাল পরে শখ জাগল। আর দুই বোন আছে—তাদের কপাল ভাল, লেখাপড়া শেখেনি, দিব্যি তারা শ্বশুরঘর করছে, ছেলেপুলের মা হয়েছে। আর আমায় উপযুক্ত পাত্রই খুঁজে পায় না ভাইরা—

বিষম উত্তেজিত হয়ে বলে, পাবে না তো, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল খুঁজেও পাবে না। পেলে তার পরে ওদের বোঝা টানবে কে? নিজেরা খুঁজে নিলাম তো, দেখুন, এই ভণ্ডুল করতে এসে পড়েছে। ওঁরও ঠিক এই রকম। দু-জনে আমাদের মিলেছে ভাল।

তা এই যেমন আমাকে বলছেন, স্পষ্ট তো ওদের বলে দিলেই হয়।

পুষ্প বলে, আপনাকে বলতে পারি। কিন্তু আমি তো দিদি নই, দেবী ওদের কাছে। পাড়াসুদ্ধ ধন্য-ধন্য করে, পাপ কলিযুগে সত্যযুগের লোক কেমন করে ছিটকে এসে পড়েছে! নিজের দিকে না চেয়ে এমনভাবে করে যাচ্ছে। আপনি সেই বলে এলেন, কিছুতে আর সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। সকালবেলা ওদের সামনে আবার সেই পাথরের দেবী হয়ে যাব।

পালাবে ওরা রাতারাতি। আমার কাছে ছুটে এসেছে—অজিত সিংকে বলে দিতে হবে, জীপে তুলে পাঠানকোটে ফেরত নামিয়ে দেয়। মিলিটারি মানুষ অজিত তো আস্তে কথা বলে না, খানাঘর থেকে সমস্ত ওরা শুনেছে।

তারপর আধ-বুড়ো মেয়েটাকে আবার সেই স্বপ্নে পেয়ে বসল। যাবে চলে পাঠানকোট থেকে দূরে—অনেক দূরে—কে জানে,

হয়তো বা আমারই বাংলা মুলুকে। একটুকু ছোট্ট কুঁড়েঘর, দু-মুঠো গম কি চাল। লেখাপড়া জানে—সামান্য একটু কাজ জোটাতে পারবে না দুয়ের কেউ ? ঝগড়া হবে, ভাব হবে আবার ; হাসি ফুটবে ঠোঁটে, জল ফুটবে চোখের পাতায়। অবোধ শিশু টলে টলে বেড়াবে উঠোনে, ধুলো মেখে শতেক দুষ্টুমিতে অস্থির করে তুলবে—ছোট্ট ঘরে কত উৎসব-সমারোহ। ভক্তিযুক্ত আত্মীয়জন নেই ঘন ঘন প্রণাম করবার—একেবারে নিজেদের ঘর।

শুনতে শুনতে আমিও আচ্ছন্ন হয়ে যাই কেমন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো নেমে চললাম পুষ্পর পিছু পিছু। সেই ডাকবাংলো অবধি গিয়ে অজিত সিংয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলাম। ভারি ভাল লাগছে। বড় ভাল জায়গা, জ্যোৎস্নাটা অতি অপরূপ আজ।

বাড়িওয়ালা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে উঠানের এমুড়ো-ওমুড়ো। রেগে টং।

চার আনা ভাড়া দিয়ে কি মাথা কিনে রেখেছেন ? আচ্ছা লোক মশাই, রাত দুপুর হয়ে গেল—তবু পাত্তা নেই। সকলকে শুইয়ে দিয়ে তবে তো আমি শুতে যাব। সারা রাত এমনি পথে পথে কাটাবেন তো আমায় খামোকা পয়সা দিতে গেলেন কেন ? রাত্তির আর কতটুকু আছে জিজ্ঞাসা করি ?

ঐ রাগের মধ্যেও সৌজন্য কী পরিমাণ, বুঝে দেখুন। এ হল আমাদের ভারতীয় আতিথ্যধর্ম। পয়সা লেনদেনের ব্যাপার যদিচ—তা হলেও লোকগুলো ঠিকমতো শুয়ে পড়ল কিনা, শোওয়ার পর কোন রকম অসুবিধা বোধ করছে কিনা—খোদ কর্তা নিজে দেখেশুনে খুশি না হওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি পান না। বাড়িওয়ালার রাগ দেখে আরও স্ফূর্তি পায় আমার।

সকালবেলা উঠে আতিথ্যধর্মের পুরোপুরি মানে পাওয়া গেল। জন কুড়িক আমরা ঘরের মধ্যে—বাইরে থেকে তালা এঁটে দিয়েছে। রাত্রে কেউ কেউ উঠে ঘরের মধ্যেই প্রয়োজন সেরেছেন —জেগে উঠেই নাকে কাপড় দিতে হল। নাক চেপে সকলে চেঁচামেচি লাগিয়েছে বাইরে যাবার জন্য। মর্মান্তিক চিৎকার আর দুয়ার ভাঙাভাঙি। কেবা শোনে কার কথা! আমার সহযাত্রী দু-জন জানলা খুলে হায়-হায় করে উঠল। নিচু পাহাড়ের রাস্তা দেখা যায়, এক এক করে বাস ছাড়ছে। ষণ্ডামর্ক হাতের গুল পাকাচ্ছেঃ ঐ ওঁরা চলে যাচ্ছেন, ঘরের মধ্যে আমরা আটক হয়ে রইলাম।

ঠাহর করে দেখা গেল, যাচ্ছে বটে—পুষ্প দেবী নয়, মেয়ে লোকই নয় আপদে, এক মারোয়াড়ি। মাথার হলদে পাগড়ি ঘোমটার মতো দেখাচ্ছে।

ও-লোক না-ই হল, যাচ্ছে তো কোন-না-কোন বাসে। ছুটো-ছুটি করে এদ্দূর এসেও দর্শন হল না!

সান্ত্বনা দিই, যাবেন কোথা দর্শন না দিয়ে? পথে না হল, একেবারে শ্রীনগর গিয়ে পা জড়িয়ে ধরবেন।

তাই, তাই—

সন্দিগ্ধ নজর তুলে আবার বলে, কিন্তু যদি মশায় ভুয়ো হয়ে যায় সমস্ত, মাংনা গাড়ি চড়বেন বলে আমাদের ভাঁওতা দিয়ে থাকেন?

বিস্তর হৈ-হল্লার পর বাড়িওয়ালা চাবির গোছা হাতে চোখ মুছতে মুছতে উদয় হলেন।

ঘুমিয়ে ছিলাম। অত রাতে নেমে গিয়েছি, উঠতে বেলা তো হবেই।

নেমে গিয়েই যে শুয়ে পড়েছিলেন, এমন মনে হয় না।

ফুর্তিফার্তির ব্যাপার ছিল, রক্তবরণ চোখ দেখে মালুম পাওয়া যায়।

ছ-পাটি দাঁত মেলে পরম আপ্যায়িত করে বলেন, নিচে থাকি কিনা—উপর দিকে খুনখারাবি হয়ে গেলেও কানে যায় না।

তা তালা দেবার কি গরজ ছিল?

আরে সর্বনাশ! এতগুলো লোক এক-সঙ্গে আছেন, চোর-জোচ্চোর ডাকাত-জেলবার্ড কত থাকেন এর মধ্যে—তালা দেবার দরুন এই সুবিধে, কোন এক কাণ্ড করে সাত-তাড়াতাড়ি পালাতে পারবেন না। অনেক ভুগে বিস্তর নাস্তানাবুদ হয়ে তবে মশায় এই ব্যবস্থা করেছি। একা আমি নই, যত ঘরওয়ালা আছে সবাই।

চতুষ্পার্শ্বে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, এত রকমারি গুণের মানুষের সঙ্গে একঘরে রাত্রিবাস করলাম! ছাড়ল স্টেশন-ওয়াগন। ওরা তাড়া দিচ্ছে: জোরে, আরও জোরে—শ্রীনগরের বাসগুলোর আগে গিয়ে পৌঁছতে হবে। এরই ভিতর আমার দিকে চোখ কটমট করে শাসিয়ে নেয়, ভাঁওতা যদি হয় তো বুঝতে পারবেন। আমি তাকিয়ে আছি খাদের দিকে। কুয়াশা সরে গিয়ে অনেক নিচের রাস্তা অল্প অল্প নজরে আসছে। একটা জীপও যেন ঐ ছুটে বেরুল বনান্তরাল থেকে? উঁহু, জীপ কোথা, অজিত সিং মাধোপুর ছাড়িয়ে পাঠানকোট ধর-ধর করল এতক্ষণ। মুখ ফিরিয়ে ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাঁক পাড়ি, জোরে, আরও জোরে—

(৩)

গাঙ-খাল বিল-বাঁওড়ের দেশ—আমার যে তল্লাটে বাড়ি। নৌকোর চলাচল খুব। বিশেষ করে বর্ষার সময়টা। বাবু-ভেয়ে আপনারা নৌকোয় যান। ঘাটে তক্তা ফেলে দিয়েছে, সন্তর্পণে তার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে উঠে গেলেন—জুতোয় কাদার ছোঁয়া না লাগে। উঠে পড়তে তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে তামাক সেজে এনে দিল—আরামে পা ছড়িয়ে বসে হুঁকো টানতে টানতে স্বভাবের শোভা দেখুন।

এমন নৌকোয় হামেশাই তো চড়েন। হাটুরে নৌকোয় গিয়েছেন কখনো? সে আলাদা ব্যাপার। হাটুরে নৌকোয় যাবেন তো মালকোঁচা সেঁটে নিন, দাঁড়ে গিয়ে বসতে হবে। আর বেগোনে দাঁড় চলল না তো নামিয়ে দেবে গুণ টানবার জন্য। এর মধ্যে বাছবিচার নেই—আপনি লাট সাহেব হলেও দেবে নামিয়ে কাদার মধ্যে।

লাট সাহেব তো লাট সাহেব—জামাই হলেও ছাড়াছাড়ি নেই। শুনবেন? আমাদের যাদব নাথের মেয়ের বিয়ে দিল ফুটফুটে এক ছোঁড়ার সঙ্গে। যেমন চেহারা, তেমনি এলাকপোশাক। আরও গুণ আছে—গানের গলা ভাল, শীতকালে যাত্রার দলে মাঝে মাঝে সখীর পার্ট করে। ভারি মিষ্টভাষী সে জন্য—'আজ্ঞে' 'ঠাকুর' ছাড়া কথা নেই। আমাদের বাইরে-বাড়ির সামনে দিয়ে পরগণার রাস্তা। ভোরবেলা রাস্তা দিয়ে হন-হন করে যাচ্ছে, বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, জামাই নাকি? এত সকাল সকাল কিসে এলে ও জামাই?

নৌকোয় এলাম আজ্ঞে—

কাদা কেন পায়ে ?

গুণ টেনে এলাম।

জামাই নৌকোতেই এসেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিলেক বসতে দেয় নি, এতটা পথ নদীর পাড়ে পাড়ে গুণ টেনে এসেছে। হাসেন কেন, হাটুরে নৌকোর দস্তুর এই। যাচ্ছেন—সারা ক্ষণের মধ্যে একবারও নৌকায় উঠতে দিল না; জল-কাদা ভেঙে নৌকো টেনে আনতে হল। তাহলেও আসা হল বটে আপনার নৌকো-যোগে।

আমি কিন্তু এসেছিলাম বেশ আরাম করে। এ ভাগ্য সকলের হয় না। বয়স আর কি কী তখন—তেরো কি চোদ্দ। কম বয়সের দরুনই হোক কিংবা অনন্ত-দা'র খাতিরেই হোক, দাঁড় টানতে হয় নি। চালে-ডালে পাকিয়ে ভরপেট ঠেসে গুড়োর উপর বসে ঢুলতে ঢুলতে দিব্যি রাত কাবার করে দিলাম।

বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম; সেখান থেকে রওনা হয়ে এসে হাটের মধ্যে ঘুর-ঘুর করছি। আবাদ অঞ্চলের মস্ত বড় হাট—হাটবার হিসাব করেই বেরিয়েছি। হাটবার ছাড়াও যাওয়া চলে—তেমন হলে আস্ত নৌকো ভাড়া করতে হয়, তিন টাকা তেরো সিকে লাগে। এসব রাজরাজড়ার পোষায়—আমাদের হাটুরে নৌকো। আর নয়তো আট ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে মেরে দেওয়া।

অনন্ত-দা আমাদের গাঁয়ের। মাথায় তাঁর মবলগ বুদ্ধি। যে মরশুমে যা মেলে, সেইসব মালপত্র কিনে হাটে হাটে পাইকারি বেচেন। ভাল ব্যবসা। সবেদ মোড়ল ভাগীদার। দেখলাম, গুড়ের হাটে ভারী ভারী চিটেগুড়ের কলসি নামিয়ে দু-জনে আগলে বসে আছেন। যাক, আপন মানুষ পাওয়া গেল—আর ভাবনা নেই। দেখতে দেখতে দুটো কলসি বিক্রিও হয়ে গেল।

অনন্ত-দা'র হাসি ধরে না: তা যাবি তুই আমাদের সঙ্গে, কী হয়েছে! রাত দুপুরে জোয়ার—জোয়ার হলে নৌকা ছাড়ব। এক্ষুণি ঘটকর্পুর হয়ে বসলি কি জন্য? দেখেশুনে বেড়াগে যা। সুন্দরবনের মানুষখেগো ধরে এনেছে, এক পয়সা করে টিকিট। দেখে আয়।

সবেদকে বললেন, বসে থাকো মোড়ল; দরদাম হতে থাকুক। চট করে আমি সের দশেক বালাম-চাল নিয়ে আসছি। ভাল জিনিষ পয়লা হাটে বিক্রি হয়ে যায়, পরে আর মিলবে না।

টাকাপয়সা অনন্ত-দা'র হাতে যেন কামড়ায়; খরচ না করা অবধি সোয়াস্তি নেই। টাকা পেলেন তো হাটের বাছা বাছা জিনিষ কিনে নিয়ে বাড়িতে ষোড়শোপচারে খাবেন। না পেলেন তো এক ঘটি জল। অনন্ত-দা'র বউ বিশ বছর কোন্দল করছে এই নিয়ে। অনন্ত-দা বলেন, আচ্ছা আচ্ছা, দিব্যি করলাম, এই বন্ধনতলায় (অর্থাৎ ঘর—দড়ি দিয়ে বাঁশখড় বেঁধে যা বানানো হয়েছে) বসে বলছি, আর এমনটা হবে না। কখনো না, কোনদিনও না।

কিন্তু টাকা এলে তখন অনন্ত-দা কে, আর রাজা রাজবল্লভই বা কে!

দু-কলসি চিটেগুড়ের টাকা গাঁটে গুঁজে অনন্ত-দা তো বালাম-চাল কিনতে গেলেন। আমিও চললাম সুন্দরবনের মানুষখেগোর সন্ধানে। খাল-ধারে চটের কানাত, হোগলার বেড়া। জগঝম্প বাজিয়ে তোলপাড় করে তুলছে। মানুষখেগো ঐখানে খাঁচার ভিতরে। ছেলেপুলে আমরা তো আছিই, বুড়ো মানুষেরা অবধি কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সদ্য ধরে এনেছে বোধ হয়, ঘন ঘন গর্জন করছে। চারিদিক তোলপাড়। অতএব নগদ একটা পয়সা ব্যয়ে ভিতরে ঢোকা গেল। ঢুকে পড়ে তাজ্জব।

সুন্দরবনের মানুষখেগো খাঁচার ভিতর ঘুমিয়ে আছে। চোখে পিচুটি পড়ছে, দু-থাবা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে মাথা কাত করে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। মালিক লম্বা সুঁচাল বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করছে তো অতিষ্ঠ হয়ে একবার চোখ মেলল ব্যাঘ্রপ্রবর। একটুকু সরে গিয়ে আমাদের দিকে পিছন করে আবার মাথা গুঁজল। গরুর চেয়েও নিরীহ এমন ভদ্র-প্রাণীর মানুষখেগো নাম রটাচ্ছে, এবং গরাদের ভিতর রেখে দিয়েছে—দেখে সত্যি কষ্ট হয়।

মালিক তাড়া দিলঃ হয়ে গেছে—বেরিয়ে যাও এবার। কানাতের বাইরে আবার ভিড় জমেছে বুঝতে পারছি। আমরা অপেক্ষায় আছি—বাঘ খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, সেই মূর্তি দর্শন করে যাব। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখিনে। মালিক রেগে উঠলঃ বলি, এক পয়সায় জায়গাটা মৌরসি করে নিলে নাকি? সারাদিন এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে? এবং সঙ্গে সঙ্গে টিনের চোঙা মুখে লাগিয়ে ব্যাঘ্রগর্জন। ঐ যে গর্জন বাইরে থেকে শুনে ব্যাকুল হচ্ছেন, ওটা বাঘ ডাকছে না—মালিকই ডেকে ডেকে খদ্দের জমাচ্ছে।

বাঘ দেখে হেলতে দুলতে বেরুলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। সময় আর কাটতে চায় না। খালের উপর কাঠের পুল—কচ্ছপের পিঠের মতন, মাঝখানটা উচু। অত উঁচু করে বানিয়েছে, পূবদেশি বড় বড় সাওড় খালের পথে আসবার সময় মাস্তুলে না আটকে পড়ে। হাট-ফিরতি মানুষজন গল্প করতে করতে যাচ্ছে। এক চাষী বাঁকের দু-দিকে দু-ঝুড়ি বেগুন নিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ দেখি, পুলের উপর বোঝা নামিয়ে দু-হাতে বেগুন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে জলে।

ছবিটা আজও স্পষ্ট আছে। লোকটার চেহারা যেন দেখতে পাই।

এটা কি করছ ভাই?

কি করি বলো। এক পয়সা দেড় পয়সা বেগুনের কুড়ি (কুড়ি বলতে গোনাগুণতি কুড়িটা বুঝবেন না কিন্তু—ছ' গণ্ডায় কুড়ি, তার উপর দুটো ফাউ, মোট ছাব্বিশে গিয়ে দাঁড়াল)। দু-ঝুড়ি বেচে গণ্ডা পাঁচেক পয়সা হত, তা-ও কেউ কিনল না। তিন ক্রোশ পথ ভেঙে এসেছি, আবার এই বোঝা অত দূর টেনে নিয়ে যাব ?

কত লোক আছে, কিনে খাবার পয়সা নেই। ডাঙায় ফেললে তারা কুড়িয়ে নিত।

মেহনত করে আর্জেছি, কষ্ট করে বয়ে নিয়ে এলাম। দিচ্ছি আমি মাংনা খেতে ! বয়ে গেছে, বয়ে গেছে—

আরও উত্তেজিত হয়ে ঝুড়ি দুটো উপুড় করে সমস্ত বেগুন খালে ঢেলে আপদ চুকিয়ে দিল।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার গুড়ের হাটে এলাম। অনন্ত-দা আর সবেদ বসে রয়েছে। সেই দু-কলসির পরে তেমন আর খদ্দের লাগেনি। বসেই আছেন তাঁরা কলসিগুলো সামনে নিয়ে।

অনন্ত-দা ভরসা দিচ্ছেন। টাকাগুলো সমস্ত বালাম-চালে খরচ করে এসেছেন—সবেদকে বলছেন, আসবে বই কি খদ্দের—না এসে যাবে কোথায় ? হাটঘাট শেষ করে তখন মানবের গুড়-তামাকের কথা মনে পড়ে। সে-হাটে ষোল কলসি উড়ে চলে গেল, এবারে এই সাতখানাও যাবে না ?

তা এসে পড়ল সত্যিই। গুড়ের হাটের ঠিক নিচেই গাঙের ঘাট। সাঁ-সাঁ করে দ্রুত বেয়ে এসে এক ডিঙি ঘাটে লাগল। লাগতে না লাগতে জন পাঁচ-ছয় তাগড়া জোয়ান লাফিয়ে পড়ল দত্যিদানোর মতো।

এই যে, এই যে কর্তা মশায়, পেয়ে গেছি। তারাই। বারে বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—

এক একটা চিটেগুড়ের কলসি মাথার উপর উঁচু করে তুলে দড়াম করে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে। কলসি ভেঙে চৌচির। সখেদ আর অনন্ত-দার আর্তনাদ। হাটের মানুষ ভেঙে পড়েছে। তারই মধ্যে দলের কর্তা মশায় গলা ফাঁটিয়ে চেঁচাচ্ছে : চোখ মেলে দেখুন মশায় সকলে। তক্কেতক্কে ছিলাম, আজকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি।

তাজ্জব বটে! কলসির উপর দিকে খানিকটা করে চিটেগুড়, নিচে মাটি। খাওয়ার গুড়ের ব্যাপারে কলসির ভিতর শলা ঢুকিয়ে পরখ করা যায়। চিটেগুড় বিষম আঠা, এ বস্তু লোকে খায় না, দা-কাটা তামাক মাখার কাজে লাগে। শলা ঢোকে না এ গুড়ের মধ্যে। অতএব গুড় বলে অনন্ত-দা নিঃশঙ্কে মাটি বিক্রি করে আসছেন।

জনতাকে উদ্দেশ করে সেই কর্তা লোকটা বলে, এই জিনিষ টাকা দিয়ে কিনে ডিঙি বোঝাই করে সেদিন বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে ওরা এ হাটে আসত না। কত দিকে কত হাট—আজ এখানে কাল ওখানে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে বেড়ায়।

চারি দিক দিয়ে রে-রে করে ওঠে : মাটি বেচে বেচে পয়সা নিচ্ছিস ? কোন তল্লাটের মাটি, কোন দেশের মানুষ রে তোরা ?

ঠাণ্ডা মেজাজে মারধোর হয় না, রক্ত গরম করার জন্য এমনি ভাবে শুরু হয়। প্রতিপক্ষ জবাব দিল তো কাজটা সোজা হয়ে গেল। কথার পৃষ্ঠে কথা ঠোকাঠুকি হতে হতে আগুন বেরিয়ে পড়ে। কিল-চড়-ঘুষি। আর কতকগুলি সাবধানি মানুষ থাকে, তারা সম্মুখ-সমরে এগোয় না। ধিন-ধিন করে নাচতে শুরু করে কচি শিশুর মতো। হাততালি দেয় আর তারস্বরে ডাকে—নারদ, নারদ! কলহের দেবতা নারদ অলক্ষ্য অন্তরীক্ষে আবির্ভূত

হয়ে গোলমালটা যাতে ভাল করে পাকিয়ে তোলেন। হাটুরে নৌকোর কথা হচ্ছিল তো—আর এই ব্যাপারটা হল হাটুরে মার।

হাটুরে মার দেখেন নি, কী মুশকিল! আকাশ থেকে পড়লেন, না বিলেত থেকে এলেন মশায়? তবে তো একটু বিশদ করে বলে নিতে হয় মাঝখানে। বলাবলি কি, ঘটনাই শুনুন একটা। হাট করে বাড়ি ফিরছি, রাত বেশি হয়ে গেছে, মাহিন্দার উপানন্দ আনাজের ধামা ও মাছের খালুই নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। হঠাৎ হৈ-হৈ করে উঠল পিছনের হাটখোলায়, অনেক লোকের চেঁচামেচি। উপানন্দ থমকে দাঁড়ায়। আমি বলি, দাঁড়ালি কেন রে? বাড়ি গিয়ে মাছ কোটা-বাছা রান্নাবান্না হয়ে তবে তো খাওয়া-দাওয়া! পা চালিয়ে চল্—

উপানন্দ বিমনা ভাবে বলে, তাই চলো।

রাশিখানেক গিয়ে কিন্তু আবার দাঁড়িয়ে পড়েঃ কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছে হাটের ভিতর!

হয় হোক গে। তোর আমার কি তাতে?

হঠাৎ পাগল হয়ে ওঠে উপানন্দঃ ও ছোটবাবু, মারামারি লেগে গেছে। ঐ যে—আওয়াজ পাচ্ছ না? আমি চললাম—

কাঁধের ধামা ঢপ করে রাস্তার উপর নামিয়ে তীরের মতন ছুটে বেরুল।

ব্যাপার আমার জানা আছে, রাগে ফুলছি—কিন্তু এমনধারা সুযোগ পেয়ে কোনো জোয়ান-মরদ পিছন তাকায় না। কারও রাগের পরোয়া করে না এই অবস্থায়—মাহিন্দারের চাকরি গেলেই বা কি! নিশিরাত্রে আমি আর কাঁহাতক পথের উপরে একা একা দাঁড়িয়ে থাকি পাশে গোরস্থান, বাঁশঝাড়—এমন-কিছু বাতাস নেই, কিন্তু ক্যাঁচকোচ আওয়াজ করে বাঁশের আগা নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ধামা তুলে নিয়ে আমিও অতএব হাটখোলা চললাম।

তুমুল ব্যাপার সত্যি। একটা লোক নিশ্চয় কোন রকম অপরাধ করেছিল। গোড়ার মারটা তারই উপর পড়ে। ব্যস, সেই লেগে গেল। অপরাধী এবং প্রথম যারা মারতে শুরু করেছিল তারা হয়তো ভিড় থেকে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ। কোথাকার লোক তারা, কি নিয়ে গণ্ডগোল—এখনকার এরা কিছুই জানে না। জানবার দরকারও নেই। যে পিঠখানায় আর দশ জনে মারছে, পরের জন গিয়েও কিল বসাচ্ছে সেখানে। ভিড়টা রীতিমত জমাট হয়ে দাঁড়াল। এবং এর পরে আরও যারা আসছে, ভিড়ের ভিতর সেঁধুতে পারছে না। তা বলে কি ছেড়ে দেবে তারা? যারা পিছন ফিরে অন্যকে পিটবার তালে ব্যস্ত, তাদের পিঠগুলো সামনে পেয়ে পরের দল সেখানে হাত চালাচ্ছে।

রাত হয়েছে, হাটবেসাতি নিয়ে মানুষজনের ফিরবার তাড়া—মজাটা সেজন্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হল না। উপানন্দ দেখি মাজা বাঁকাতে বাঁকাতে বেরিয়ে আসছে। আমায় দেখতে পেয়ে স্ফূর্তিতে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হেসে বলে, এই যে—ছোটবাবুও এসে পড়েছ। তা হল-টল কিছু?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কি হবে?

হাতের সুখ কিছু করতে পারলে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমার আরও কিছু হত—কিন্তু পিছনে যারা ছিল, তারা শেষটা জিওলের ডাল ভেঙে পেটাতে লাগল। পিঠে আর সইল না, তাই বেরিয়ে এলাম।

কোমর ও পিঠের উপর ডালের আঘাতের স্পষ্ট দাগ পড়েছে, রক্ত ফুটে বেরিয়েছে সরলরেখার ধারে। খুব ফুর্তি উপানন্দর। বলে, কিছু না ছোটবাবু, মাছ ধরতে গেলে গায়ে কাদা না লেগে কি যায়?

মনের উল্লাসে ধামা-খালুই নিয়ে যেন নেচে নেচে বাড়ি চলল।

হাটুর মার এই বস্তু। মেরেছেন কখনো এমনধারা? মার খেয়েছেন? অনন্ত-দা বহুদর্শী ব্যক্তি। গালিগালাজ ধাপে ধাপে চরমে উঠে যাচ্ছে, এক তরফেই হচ্ছে সমস্ত, অনন্ত-দা কিছুতে রা কাড়েন না। এক পা দু-পা করে পিছিয়ে জলের দিকে যাচ্ছেন। মতলব বুঝে ফেলেছে ওরা। বলে, মাটি বেচে দিয়ে সরে পড়ছে ঐ দেখ। ধরো ধরো—

তখন ঘাটের উপর এসে গেছেন, তাঁকে পায় কে? সমস্ত আমার চোখের উপর দেখা—নিজের বিপদও ঘটতে পারে, কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে হাঁ করে অনন্ত-দা'র কাণ্ড দেখছি। মানুষজন তাড়া করছে—আর ফড়িঙের মতন অনন্ত-দা এ-নৌকো থেকে ও-নৌকোয় তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে পড়ছেন। হাটবারে পাঁচ-ছ'শ নৌকো জমেছে, জল দেখবার উপায় নেই। তারই উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে জলে পড়ে সাঁতার কাটলেন কিম্বা জঙ্গলে উঠে ছুটে পালালেন—কারো কিছু ঠাহর হল না। হাটুরে লোকেরও বেশি খোঁজাখুঁজির ধৈর্য নেই—বিশেষ করে হাতের মুঠোয় আর এক শিকার রয়ে গেছে যখন। পালাবার জন্য দু-পা না ছুটতেই ভালমানুষ সবেদকে জাপটে ধরেছে।

আর কে আছে তোদের দলে?

এই রে, নিজের কথা ভুলে মজা দেখছি। কেউ যদি দেখিয়ে দেয় আমাকে—ওদেরই গাঁয়ের, অনন্তকে দাদা-দাদা বলে, অনন্তর পাশেই বসে ছিল এতক্ষণ?

ইতি-উতি তাকাই। দৌড় দিলেই মারা পড়ব, হাটের মানুষ পিছু নেবে। সরকারি ডাক্তারখানা সামনে—কপাল ভাল, একটা খালি পালকি ডাক্তারখানার মাঠে রয়েছে। ভাল ঘরের কেউ এসেছে ডাক্তারখানায় রোগ দেখাতে। রোগি নেমে গেছে, বেহারারা তামাক-টামাক খাচ্ছে গাছতলায় বসে। আমি টিপি-

এসে পড়ল তার নিচে। কূলের দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলার আওয়াজ : পারে যাব—

দাঁড়িরা দাঁড় তুলে ফেলে তো হাল আরও ডবল জোরে বাইছে। ছোট্ট খালে তুফান উঠে গেল। একজনে বলে, শুনতে পেলে না মাঝি? পার করে দিতে বলছে।

আবাদ অঞ্চলের নিয়ম, কেউ পারে যেতে চাইলে যত তাড়া থাকুক আর অসুবিধা যতই হোক—নৌকো পাড়ে ধরে পার করে দিতে হবে। দাঁড়িরা তাই মনে করিয়ে দিচ্ছে, শুনতে পেলে না?

মাঝি ফিসফিসিয়ে বলে, মানুষ কক্ষণো নয়। ঘরগ্রাম পথঘাট নেই—মানুষ রাত দুপুরে এখানে কোন কাজে আসবে? হাত-পা কোলে করে বসে রইলে কেন তোমরা? জায়গা খারাপ—তাড়াতাড়ি দাঁড় মেরে ওঠো।

গা ছমছম করে। মানুষ নয়—তা হলে কি ঠাউরেছে মাঝি? ভূতপ্রেত কিম্বা ডাকাত-লেঠেল? দাঁড় থেমে ছিল, ঝপ্ পাস করে ছ-খানাই পড়ল একসঙ্গে। এক টানেই নৌকো আধ রশিটাক এগিয়ে গেল। অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাক আসে, পার না করে চললে যে তোমরা?

গলা শুনে চিনতে পেরেছি আমি।—অনন্ত-দা, তুমি ওখানে?

নৌকোর ব্যাপারিরাও চিনেছে। বলে, তাই তো, অনন্তর গলার মতো ঠেকছে। ও অনন্ত, ওখানে কি কর? এলে কোত্থেকে?

অনন্ত-দা বলেন, নৌকো ধরো। উঠে আসি—তারপরে সব বলব।

গলা চেনবার পরেও এতগুলো কথা বলাবলি কেন হয় বলুন তো? কোন এক মানুষের স্বর নকল করেও তো ছলনা করতে পারে। তাই কিছু বেশি কথা বলিয়ে নিঃসংশয় হওয়া।

নৌকো অশ্বত্থের ঝুরির মধ্যে নিয়ে ধরতে অনন্ত-দা গলুয়ে উঠে বসে ধীরেসুস্থে পায়ের কাদা ধুতে লাগলেন। কিছুই যেন হয় নি—বহাল তবিয়তে কোন এক বিয়ের বরযাত্রী হয়ে চলেছেন, এমনিধারা ভাব।

পারে যেতে চাচ্ছ কেন ও অনন্ত, সেখানে কি ?

অনন্ত-দা ইতিমধ্যে কলকে টেনে নিয়েছেন একজনের হাত থেকে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন, কচু ওপারে। অন্ধকারে ঠাহর হয় না—বুঝব কি করে যে আমাদের নৌকো ? পারের কথা বলে ভাব নিচ্ছিলাম। এ যদি আমাদের নৌকো না হত, ওপারেই গিয়ে দাঁড়াতাম ; সেখান থেকে চেঁচাতাম এপারে আসব বলে। পারাপার চলত যতক্ষণ না তোমরা এসে পড়।

খানিক টেনে টেনে কলকে রেখে দিয়ে বললেন, ধোঁয়ায় পেট ভরে না। সেটার উপায় কি করি ? তোমরা সবাই তো হাটখোলা থেকে সেরেসুরে এসেছ।

সাহস পেয়ে আমি বলে উঠলাম, আমিও খাবো। ক্ষিধেয় নাড়ি পাকাচ্ছে অনন্ত-দা।

চল্, খলবেমারি অবধি তো যাওয়া যাক। সেখানে দোকান আছে।

খাল এসে বুড়িভদ্রায় পড়েছে ; খলবেমারি সেই মোহানা। ছোট জায়গা—তবে গোনের অপেক্ষায় অনেক সময় নৌকা বেঁধে থাকে বলে ঘাটের উপর একটা দোকান হয়েছে। দোকানে প্রায় সর্ববস্তু পাওয়া যায়। দোকানি অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে, দুয়োর ভাঙাভাঙি করে তাকে ডেকে তোলা হল।—চাল তো দাও, আর কি আছে বলো। ডাল আছে ? বেশ, মশুরির ডালই দাও তবে। নুন দাও, লঙ্কা দাও। তেল নেই তো বয়ে গেল। আবার বললেন, বালামচাল কিনে এই সাড়ে-সাত আনা বেঁচেছে। তার মধ্যে

যদ্দূর কুলোয় নিয়ে নে। আলু-ভাতে খাবি? নিয়ে নে আলু এক পোয়া।

নৌকো থেকে ওদিকে হাঁক পাড়ছেঃ গোন বয়ে যায়—দোকান সুদ্ধ সওদা করে আনছ নাকি? এমন কাণ্ড দেখিনি বাবা! তাড়াতাড়ি করো, নয় তো চললাম কিন্তু তোমাদের ফেলে।

ছুটতে ছুটতে এসে নৌকোয় উঠি। পাট কেচে নিয়ে গেছে, পাটকাঠি গাদা হয়ে আছে নদীর ধারে। মটমট করে ভেঙে নিয়ে এলাম কতকগুলো। কুমোরের বানানো পোড়া-মাটির উনুন আছে নৌকোয়—পাটকাঠি সাজিয়ে উনুন ধরিয়ে বসেছি। একজনে বলে, দাঁড়ে এসো ছোকরা, চালাকি চলবে না।

অনন্ত-দা ফাঁস করে দিলেনঃ এইটুকু ছেলে—দাঁড় কি ধরেছে কখনো? ওসব পারে না—জলে পড়ে গিয়ে একখানা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

লোকটা হো-হো করে হেসে উঠলঃ দাঁড় ধরতে পারে না—কি পারে তা হলে? কলম ধরতে? তুলতুলে হাত দেখেই তা বুঝেছি। তবে যে এত ফুটানি করছিল!

মানরক্ষার দায়ে জোর করে বলি, পারি আমি। দেখ তা হলে—

অনন্ত-দা বললেন, উঁহু, যা করছিস করে যা তুই। তোর ভাগের দাঁড় আমি টেনে দেব। চালে-ডালে খিচুড়ি পাকাতে পারবি তো রে? তেল হল না—তা দেখিস, নুনটুন যেন কম না হয়।

নুন যা কেনা হয়েছে সবটা কড়াইতে ঢেলে দিয়ে বললাম, কম কক্ষণো হবে না, খাওয়ার সময় দেখে নিও।

বুড়িভদ্রায় পড়েছি অনেকক্ষণ। ফাঁকা নদীতে হাওয়া দিয়েছে। উনুন দাউদাউ করে জ্বলে কখনো, পর মুহূর্তে নিভে যায়। দাড়ের টানে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে চলছে নৌকো। রান্না

ঝকমারি এই অবস্থায়। তার উপরে ক্ষুধার্ত অনন্ত-দার ঘন ঘন তাগাদাঃ হল তোর? ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রান্না চাপিয়ে দিয়ে? কোন কর্মের নোস—এতক্ষণে যে পোলোয়া-কালিয়া রেঁধে খাইয়ে দেওয়া যায়।

যতদূর হবার হয়েছে। তাগিদের চোটে নামিয়ে ফেললাম। দু-খানা পদ্মপাতায় ঢেলে নিয়েছি। চাল ও ডাল দুই বস্তু যেন স্নান করে উঠে এসেছে, পাতার প্রান্তে জল গড়িয়ে নৌকোর পাটাতনে পড়ছে। তবু সে যে কী অমৃত হয়েছিল—আপনাদের খাওয়াতে পারলাম না, বিশ্বাস করবেন কি করে!

রাত শেষ হয়ে আসে। বড়-গাঙ ছেড়ে আবার ছোট খাল। খাল ক্রমশ সরু হয়ে এল। সে এমন, লাফিয়ে এপার-ওপার হওয়া যায়। কাটা-খাল—আমাদের বিলের জলপথ। এই খাল ছেড়ে দিয়ে এবারে বিলে পড়ব।

প্রশস্ত মাটির বাঁধ বেঁধে খালের মুখ আটকানো। বর্ষায় বিলে অতিরিক্ত জল জমে, ধানবন ডুবে যায়, সেই সময়টা বাঁধ কেটে জল বের করে দেয়। শীতকালে মাটি ফেলে আবার নতুন বাঁধ বাঁধে। প্রতি বছরই চলে এই রকম। হাটুরে নৌকো ঐ মাটির উপর দিয়ে টেনে ওপারের বিলের জলে ফেলতে হবে। মরদেরা সবাই নেমে পড়ল। নৌকোর গুড়োর সঙ্গে কাছি বেঁধে দিচ্ছে টান। পিছন থেকে ঠেলেও দিচ্ছে। শেষ রাত্রি, চাঁদ দেখা দিয়েছে একটুখানি আগে।

দিগন্তবিসারী ধানবনের মধ্যে দিয়ে ডিঙি ও ডোঙা চলবার সরু সরু দাড়া। ধানবন ঘেঁসে এসেছে দু-পাশে, পাতার ধারে দাগ হয়ে যাচ্ছে গায়ে। এমন গতিক, উল্টো দিক থেকে আর একটা নৌকো এলে কাটাবার জায়গা নেই। দাঁড় চলে না, ধ্বজি মেরে মেরে এগুচ্ছে। জল যেখানটা বড় কম, কাদায় নেমে পড়ে ঠেলছি।

কূয়ো দেখা যায় মাঝে মাঝে। অর্থাৎ বিলের মাঝখানে খুব ছোট আকারের পুকুর। বিলের জল যত কমে আসবে, মাছ গিয়ে জমবে ঐ সব কূয়োয়। পাড় উঁচু, শোলাগাছ পাড়ের উপরে। সরু-পাতা ঐ সব শোলার ঝাড় দেখে কূয়োর নিশানা পাচ্ছি। চারো-ঘুনসি পাতে কূয়োর মুখে—মাছ কূয়োয় যাবার মুখে এই সব ফাঁদের ভিতরে ঢুকে যায়।

এমনি এক কূয়োর কাছাকাছি এসে অনন্ত-দা সবেদের গায়ে খোঁচা দিলেন: নামো দিকি মোড়ল—

সবেদ অনন্ত-দা'র গতিক জানে। সে গা করে না। বার দুই-তিন ডাকাডাকির পরে বলে, কোথায়?

অনন্ত-দা বলেন, ভাল চালগুলো তো বরবাদ করে দিল। তা দেখা যাক, মাছ পাওয়া যায় কিনা চাট্টি।

সবেদ ডিঙির উপর পাথর হয়ে বসে থাকে। কিছুতে নড়বে না। বলে, চারো ঝাড়তে যাচ্ছ? ফের বেকায়দায় পড়বে কিন্তু। ধানবনে ওরা ঘাপটি মেরে থাকে। কূয়োর কাদায় পুঁতে ফেলে।

অনন্ত-দা অবহেলায় ঘাড় নাড়েন: হ্যাঁ, ওদের গাঁ-গ্রাম ঘর-বাড়ি নেই কিনা—শেষরাত্রে বিলের মধ্যে বসে বসে পাহারা দিচ্ছে!

ভীতু মানুষ সবেদ কিছুতে নড়বে না। বিশেষ করে হাটের ঐ ব্যাপারের পর। অনন্ত-দা, মনে হচ্ছে, এরই মধ্যে বেমালুম সব ভুলে গেছেন। নেমে পড়লেন তিনি কাদার মধ্যে। গরম হয়ে আমার হাত ধরে বললেন, তুই আয় দিকি। মোড়লটা হল এক নম্বরের মেয়েমানুষ।

ডিঙির মাঝি সাবধান করছে: মানুষ না থাক, মা-মনসার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সব আছেন কিন্তু। নৌকো ভরে ভরে মা বিলে ছেড়ে দিয়ে যান।

এটা খুব সত্যি, এতে কোন সন্দেহ করা চলে না। জল-ভরা

তেপান্তরের মাঝে ডাঙা বলতে ঐ সব কূয়োর পাড়, এবং ধান-ক্ষেতের সরু সরু আ'ল। যত সাপখোপ ঐ সব উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেয়। শোলা-ঝাড়ের মধ্যে দেখবেন বিস্তর গর্ত, শামুকের খোলা গাদা হয়ে আছে গর্তের ধারে। অর্থাৎ শামুক-ভাঙা কেউটের বিচরণক্ষেত্র—ছোবলের পর ছোবল মেরে ঐ সব শামুক ভেঙে ভেঙে খেয়েছে। মানুষও তা বলে ছাড়ে না। মাছ ধরবার জন্য আসতে হয়—সাপে কাটে, সাপুড়েরাও এসে সাপ ধরে নিয়ে যায় অজস্র। বড্ড কমে এলে মনসা ঠাকরুন এক রাত্রে হঠাৎ এসে নৌকাখানেক নতুন সাপ চুপি চুপি ছেড়ে দিয়ে যান।

ডিঙির মানুষদের অনন্ত-দা বললেন, তোমরা এগোও; আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থেকো না। বিল ভেঙে সোজাসুজি পাড়ি মেরে আবার ঠিক তোমাদের ধরে ফেলব।

বললেও কিনা দাঁড়াত তারা! সারা রাত জেগে এসেছে—বাড়ি গিয়ে হাত-পা মেলে জিরোবার জন্য ব্যস্ত। ধ্বজি মেরে মেরে এগুচ্ছে নৌকো। আর হাঁটুভর কাদাজলে ধানবনের ভিতর দিয়ে আমরা শোলাগাছ লক্ষ্য করে যাচ্ছি। একটু-আধটু ভয় যে হচ্ছে না, এমন নয়। কিন্তু মাছ ধরার পুলক—আর ঐ লজ্জা, সবেদের মতো আমাকেও মেয়েমানুষ না বলে বসেন অনন্ত-দা!

হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়েছে ধানগাছ। চাঁদের আলো ধান-পাতে ঝলমল করছে। কূয়োর পাড়ে গিয়ে উঠেছি। চারো-ঘুনসি পেতে কাঁটা দিয়ে শক্ত করে ঘিরেছে—ধেড়ে, শুইসাপ মাছের লোভে এসে যন্ত্রগুলো ভেঙে দিয়ে না যায়। কিন্তু মানুষ ঠেকাবে কোন কায়দায়? সন্তর্পণে একের পর এক চারো তুলে অনন্ত-দা মাছ ঝাড়ছেন। মাছ আর কোথা—গোটা কয়েক কই-মাগুর-সিঙি। গামছায় বেঁধে নিয়েছি সে ক'টা।

নিশ্বাস ফেলে অনন্ত-দা বলেন, গেরোটাই খারাপ। কিচ্ছু হল না। চল্—

ধানবনের সীমানা ধরে হাটুরে ডিঙি ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। খুব বেশি দূর যায় নি। ভোর হয়েছে—ধ্বজির মাথা ধানগাছ ছাড়িয়ে এক একবার উঁচু হয়ে উঠছে, দেখতে পাচ্ছি। বললাম, এ কোন দিকে যাও অনন্ত-দা? নৌকো ঐ চলেছে—ঐ যে ডান দিকে—

অনন্ত-দা খিঁচিয়ে ওঠেন: বকবক করিসনে। আমি যাচ্ছি, পিছন ধরে আয়—

এত বড় বিল পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবে নাকি?

অনন্ত-দা বলেন, হাঁটতে পারিস না—কোন নবাব সিরাজদ্দৌলা বটে রে?

অতএব চললাম। জল ছিটকে ওঠে মুখে-চোখে। আ'লের উপর হোঁচট খাই, শামুকে পায়ের তলা চিরে যায়। অবস্থা দেখে করুণা হল বোধ করি অনন্ত-দার। নরম সুরে বলেন, একটু না হয় জিরিয়ে নিতিস—কিন্তু জলকাদা আর চেঁচোঘাসের মধ্যে বসবি কোথা? আস্তে আস্তে চল্, বেলা হয়ে যাবে গাঁয়ে পৌঁছতে—হোকগে!

চোখে আমার জল আসবার মতো। বলি, নৌকো চড়ে তো বেশ আরামে যাওয়া যেত অনন্ত-দা!

যাওয়া গেলে এত কষ্ট করব কেন রে? মাছের ভাগ চাইত ওরা। সবাই দুটো-একটা করে নিয়ে নিলে কি থাকত, বল্? এখন আমাদের এই দুটো মাত্তোর ভাগ। চালগুলো ছড়িয়ে নয়-ছয় করে দিল, দুপুরে ভাতই হবে না হয়তো। তবু মাছ দেখলে খুশি হবে তোর বউদি। তুই ছেলেমানুষ—তোর ভাগে বড় মাগুরটা। আর যা যা তুই পছন্দ করিস।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স তখন—ছেলেমানুষ তো বটেই।

অনন্ত-দা'র কথা শুনে মনটা কি রকম হয়ে গেল। বললাম, মাছ আমি নেব না—

অনন্ত-দা'র ইজ্জতে লেগেছে, রুক্ষস্বরে বললেন, কষ্ট করলি, মাছের ভাগ কেন নিবিনে শুনি? দয়া করছিস? দান করছিস?

বউদি খুব ভাল মাছের ঝোল রান্না করেন। আমি আজ তোমার ওখানে খাব অনন্ত-দা। মা'কে বলে আমার চাল ক'টা দিয়ে আসব।

সেকালে আমার মাকে গ্রামসুদ্ধ লোকে জানত। খারাপ জিনিষ আর কম জিনিষ তাঁর হাতে ওঠে না। এক জনের চাল বললে যা দেবেন, নেহাৎ পক্ষে জন চারেকের তা ভরপেট হয়ে যাবে।

হাটুরে নৌকোয় রাত্রি জেগে এসে দুপুরবেলাটা অনন্ত-দা'র বাড়ি ভারিক্কি রকমের আহারাদি হয়েছিল সেদিন।

সুন্দরবনে গেলাম সেবার। ছঁই-দেওয়া বড় নৌকো। দূর এমন-কিছু নয়—কলকাতা থেকে শ' দেড়েক মাইলের ভিতর। অথচ আর এক জগৎ যেন! সিনেমার ক'জন মাতব্বর যাচ্ছেন জঙ্গলে ছবি তোলা চলে কিনা, পরখ করে দেখতে। বন্দুক ও শিকারি যাচ্ছে। বাদায়-ঘোরা একজন ঝানু লোকও যাচ্ছে, তার নাম কুঞ্জ। আমি যাচ্ছি—নতুন আর কোন গল্প ফাঁদা যায় বাদাবন নিয়ে। আরও দু-বার গেছি, তখন পাকিস্তান হয় নি। অনেক জায়গা নিয়ে ঘুরেছি। সুন্দরবন তখন বিশাল এলাকা, মনের সুখে বিস্তর ঘুরে বেড়িয়েছি।

পয়লা রাত্রেই এক বিপত্তি। কামারঘাটায় নৌকো বেঁধে ঘুমুচ্ছি। জঙ্গলে একা-দোকা থাকতে নেই—আরও পাঁচ ছ'টা

নৌকো আছে, অতএব নিশ্চিন্তে কাছি করেছি তাদের পাশে। কামারঘাটা শুনে ভেবে নেবেন না ঘাটের উপরে কর্মকার-পল্লী। ঘোর জঙ্গল, জনবসতি নেই কোন দিকে—কোন এককালে কামারেরা হয়তো বসতি করত, সেই নামটা রয়ে গেছে। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে, মরে ঘুমুচ্ছি আমরা সকলে।

রাত দুপুরে মাঝি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। কী ভয়ানক আর্তনাদ! সবাই লাফিয়ে উঠি। কি, ব্যাপার কি? নৌকো বানচাল। জোয়ার এসেছে কখন, কোটালের টান—কাছি খুলে গিয়ে নৌকো বেরিয়ে পড়েছে। দিনমানের মতো পরিষ্কার জ্যোৎস্না। বিশাল নদীর এপার-ওপার দেখা যাচ্ছে না। হাল চেপে ধরে সামাল দেবে, কিন্তু এ অবস্থায় বেশি জোরজারি করতে গেলে নৌকো উল্টে যাওয়ার সম্ভব। ক্ষণে ক্ষণে ধানক্ষেতও দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ বাদা থেকে মানষেলার ভিতরে আমাদের ফেরত এনে দিল জোয়ারে। কি ভাগ্য, নৌকো কোন ঘোলার মধ্যে পড়ে নি! ঘুমন্ত অবস্থায় সবসুদ্ধ তবে জলতলে যেতাম। নদী সরু হয়ে আসে ক্রমশ, জলের বেগও কিছু কম। নৌকো অবশেষে আবার তীরে নিয়ে বাঁধা হল।

প্রায় নিঃশব্দ ছিল এতক্ষণ সকলে, মনে মনে বোধকরি ইষ্টনাম জপছিল। কিনারায় পৌঁছে কলরব উঠল।

ঘুমোব না আর কেউ। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই ফাঁকে গাঙ এই শত্রুতা সাধল।

শত্রুতা নয়, রসিকতা করল একটুকু। পুরো একটা দিন লাগবে আবার সেই জায়গায় পৌঁছতে।

রসিকতা আরও কিঞ্চিৎ হল সে যাত্রায়। তবে আমাদের উপরে নয়। বলছি, শুনুন।

একটা পুরো দিন গিয়েছে তার পরে। দেড় প্রহর বেলা,

পাশখালি দিয়ে যাচ্ছি, দু-পাশে ঘন জঙ্গল। ডালপালায় মাথার উপরটা প্রায় ঢাকা। আকাশে সূর্য কড়া রোদ ঢালছেন—কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নৌকো থেকে ক-জনে নেমে পড়লাম, পায়ে হেঁটে ভাল করে জঙ্গল দেখতে চাই। আগে পিছে দুই বন্দুক।

জোয়ারের সময় এসব জায়গা জলে ভরে যায়। এখন ভাঁটা সরে গেছে—নোনা কাদা নিকানো আঙিনার মতো তকতক করছে। পাঁচ জন আমরা দশখানা পা ফেলে চলেছি। পা টেনে তোলাই কঠিন, চটচট শব্দ হচ্ছে। কুঞ্জ রাগ করে বলে, কেমনতরো লোক আপনারা মশাই—বাদাবনে চলতে জানেন না? অত শব্দসাড়া করলে ওঁয়ারা টের পেয়ে যাবেন যে!

বাদাবনে কেউ বাঘের নাম করে না—এমনি ঠারেঠোরে বলতে হয়। বাঘের ঘরে চোর হয়ে অনধিকার প্রবেশ করেছি আমরা যেন। বন্দুকওয়ালা দু-জন উপর দিকে নজর রেখে চলেছে—কায়দা মতো দোডালা পেলে মাচা বাঁধবে। হরিণের দল সন্ধ্যার পর খালধারে কেওড়াপাতা খেতে বেরুবে, উপরে বসে শিকার হবে সেই সময়। গাছাল বলে এই কায়দার শিকারকে।

অদৃষ্ট ভাল—গাছের উপরে এক তৈরি মাচা। কষ্ট করে বানাতে হল না। দু-পাঁচ দিনের ভেতর কেউ এসে শিকার করে গেছে। আর কি—নৌকোয় ফিরে নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া হোক এবার। সন্ধ্যার সময় বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে শিকারিরা মাচায় চড়ে বসবে।

নৌকো খাল বেয়ে এতক্ষণ ধরে এগুচ্ছে। আঁকা-বাঁকা খাল—পথ কিন্তু সামান্যই গিয়েছে। সমস্ত জঙ্গল কুঞ্জর নখদর্পণে—মাঝিকে বলে দিয়েছিল, দোখালার মুখে গেঁয়োর শিকড়ে নৌকো বাঁধতে। তা জায়গা ভালই পেয়েছে। দু-খানা গোলপাতা

বোম্বাই নৌকোও আছে এসে ঐখানে।" ভরসা পেয়ে ইতিমধ্যে ওরা ডাঙায় নেমে ভাত চাপিয়ে দিয়েছে।

রান্নাও এক ব্যাপার। নৌকোর খোলে অত লোকের রান্না-খাওয়ার অসুবিধা—হাত পাঁচ-ছয় একটু ফাঁকা জায়গা দেখেছে পাড়ের উপর, সেইখানে নেমে উনুন ধরিয়েছে। কাঠের অভাব নেই—শুকনো কাঠ-পাতা এদিকে-ওদিকে বিস্তর। ভেঙে নিয়ে এলেই হল। উনুন ছাড়াও বাইরে এক পাঁজা কাঠ ধরিয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে উঠছে অগ্নিশিখা। ওটা হচ্ছে জন্তুজানোয়ারদের ভয় দেখানো। আনমনে খাবার পাকাচ্ছে, বলা যায় না—পিছন থেকে জঙ্গলের কোন প্রভু ক্যাঁক করে সেই পাচকেরই টুঁটি ধরে কোপ্তা বানাতে নিয়ে ছুটলেন। সেই ভয়েই আগুন করেছে—আগুন বস্তুটা ওঁদের পছন্দের নয়। আরও আছে—পাঁচ-সাত জন পাঁচ-সাতটা ছাতা মাথায় রান্নার জায়গাটা গোল করে ঘিরে বসেছে। দুটো কারণ। হাওয়ার জন্যে উনুনের আগুন হাঁড়ির তলায় না লেগে বেরিয়ে আসছিল—ছাতা দিয়ে হাওয়া রোধ করা। এবং আগুন সত্ত্বেও ব্যাঘ্ররাজ যদি বা উঁকি-ঝুঁকি দেন, কালো কালো ছাতা দেখে আর ভরসা পাবেন না।

নাকে-মুখে তাড়াতাড়ি চাট্টি গুঁজে শিকারি দু-জন আবার বেরুল। পথ হারাবার ভয়ে কুঞ্জকে সঙ্গে নিয়েছে। গাছে উঠে মাচার উপর বসে দিনের আলো থাকতে থাকতে সুবিধা-অসুবিধা পরখ করে আসবে। কিন্তু ফিরে এলো তারা অনতিপরেই। ফিসফিস কথাবার্তা—চেহারাই যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। সামাল, সামাল! ভারি গরম জায়গা এটা। এই কথাটা জানান দিতে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে।

গরম জায়গা হল যেখানটায় বাঘের চলাচল। সেই যে আমরা হেঁটে হেঁটে চলে এলাম—কাদার উপর আমাদের পায়ের

দাগগুলো তেমনি আছে। কিন্তু সর্বনেশে ব্যাপার—সেইখানে আবার বাঘের থাবা পড়ছে। অর্থাৎ আমরা যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আসছি, তিনিও পিছু নিয়েছেন। অতগুলি সুখাদ্য চোখের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোভ সামলানো দুঃসাধ্য বটে! দু-দুটো বন্দুক দেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভরসা পাননি, চুপি চুপি এই অবধি এসে আস্তানাটা দেখে গেছেন শুধু।

কুঞ্জ বলে, কি বলব মশায়রা। যিনি এসেছিলেন, বড় সহজ পাত্র নন তিনি। কুলোর মতন এক-একখানা থাবা। এমন তাজ্জব জন্মে দেখিনি।

একজন হাঁক দিয়ে উঠলেন : নৌকো এক্ষুণি সরিয়ে ফেল মাঝি! অন্য কোথাও নিয়ে যাও।

কিন্তু হাঁকডাকে তো নৌকো চলে না। ভাঁটা সরে গিয়ে খালে এক ফোঁটা জল নেই—কাদার উপরে নৌকো। ধাক্কাধাক্কি করে গাঙে নিয়ে যে ফেলবে, নোনা-কাদায় জারিজুরি চলবে না। নৌকো ঠেলবে কি—মানুষেরই কোমর অবধি কাদার ভিতরে বসে যাবে।

অতএব জোয়ার আসা অবধি চুপচাপ না থেকে উপায় নেই। নিঃশব্দ সকলে। ছইয়ের দু-দিকে শিকারি দু-জন বন্দুক বাগিয়ে খাড়া আছে। আততায়ী এসে পড়ল বলে—এমনি একটা ছমছমে ভাব। এরই মধ্যে সাহসী একজন ডাঙায় নেমে অদূরের শুকনো উলুবনে আগুন ধরিয়ে এলো। দাউদাউ করে জ্বলছে।

বেলা পড়ে এল। জঙ্গলে দিনমান দেখতে দেখতে আঁধার হয়। কল-কল করে জল আসে এবার খালে। জোয়ার এসেছে। দেখতে দেখতে নৌকো ভেসে উঠল। শিকারি দু-জন আর কুঞ্জ বন্দুক ও টর্চ নিয়ে নেমে গেল। মাচায় গিয়ে উঠবে। নৌকো ছেড়ে দিয়েছি আমরা। খাল যেখানে আবার বড় গাঙে পড়েছে,

সেই মোহনায় ফরেস্ট-অফিস। অফিসের ঘাটে নৌকো বাঁধব। সকালবেলা কুঞ্জরা ঐখানে গিয়ে মিলবে।

দুটো দাঁড় পড়ছে, মাঝি সর্বশক্তিতে বাইছে। কাড়ালে মাঝির পাশে আমি। জলস্রোতে দুলে দুলে যাচ্ছি। এতক্ষণের দুশ্চিন্তার পর মনে স্ফূর্তি লেগেছে। কলম বাগিয়ে একটু-আধটু শুরু করেছি। গোলের নৌকা দুটো ঝপঝপ দাঁড় ফেলে হেলে দুলে আসছে পিছনে।

এমনি সময়—হৈ-হৈ রব উঠল গোলের নৌকো থেকে। ছুটো-পাটি, চিৎকার, টর্চ ফেলচে, বাঁশী বাজাচ্ছে, তুমুল কাণ্ড! বাঁশী হল বিপদের সঙ্কেত। দেখাদেখি আমরাও বাঁশী বাজালাম। জঙ্গলের ভিতর থেকে দুড়ুম-দুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ। আমাদের সেই শিকারিরা। মাচা থেকে শুনতে পেয়েছে আমাদের বাঁশী; দেওড় করতে করতে দ্রুত আসছে। সব ক'টা দাঁড় নামিয়ে দিয়ে; দাঁড়িরা প্রাণপণে বাইছে। সাঁ-সাঁ করে জল কেটে ছুটেছে নৌকোগুলো।

হল কি রে বাপু? কোথাও কিছু নয়—শেষ নৌকোটায় হঠাৎ চিল যেন ছোঁ মারল পাড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে। কিম্বা বিদ্যুতের ঝিলিক মারল। চক্ষের পলকে ঘটে গেল। ঝপাং করে এক ভারী বস্তু পড়ল অগভীর খালের জলে। জল ছিটকে উঠল। তখন মালুম হল, বাঘ। বাঘে লাফ দিয়েছিল নৌকোয়। পা-ও একটু পড়েছিল—নৌকো কাত হয়ে গিয়ে আবার সোজা হল।

বাঘের ঐ রীতি—দুই লাফ দেয়। তাক ছিল মাঝির উপরে সম্ভবত। এক লাফে শিকারের টুঁটি ধরবে; আর এক লাফ দিয়ে পলকের মধ্যে শিকার সহ ওপারের বাদায় ঢুকে পড়বে। কিন্তু চলতি নৌকো বলে—কিংবা মাঝিরই কপাল গুণে তাক ফসকে জলে গিয়ে পড়ল।

বলে, দেখনি তোমরা? অনেকক্ষণ তো ছিল। নোনা কাদায় বাঘের পা বসে বসে যাচ্ছিল। যেন কিছুই হয়নি—ভালমানুষের ভাবে কাদার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপারে উঠে গেল। নৌকোর দিকে তাকালই না মোটে। দেখতে পাওনি?

কিছুই দেখিনি। বন্দুক নিয়ে শিকারিরা তখন নৌকোয় পৌঁছে গেছে। আর ভয় নেই। বড় গাঙও বেশি দূর নয়।

(৪)

কলকাতা যাচ্ছি। প্রথম সেই কলকাতা দেখা। রেলগাড়ি দেখা এবং রেলে চড়াও হয়ে যাচ্ছে এই মওকায়। মাদার বক্সর ঘোড়ার গাড়িতে যশোর অবধি ভাড়া এক টাকা। এটা হল সাধারণ দর। পালে-পার্বণে দেড়া কখনও বা দুনো হয়ে যায়। পথ তো সাকুল্যে কুড়ি মাইল—কোম্পানির মাপজোপের মাইল, লোহার খোঁটায় নিশানা দেওয়া, দশ পা যেতে না যেতেই মাইল পুরে যায়। এমনি বিশ নম্বরের খোঁটায় পৌঁছবার মাশুল ষোল আনা। টাকা-পয়সা যেন খোলামকুচি ভেবেছে, বলুন না! গায়ে তাগত থাকলে কে যাবে অত দরের ঘোড়ার গাড়ি চড়তে? হেঁটেই মেরে দেবে পথটুকু।

মুশকিল হয়েছে, আমি বাচ্চা একেবারে। সেজ-দা বুদ্ধি বাতলালেন, স্টিমারে যাই না কেন? ঝাঁপা থেকে ঝিকরগাছা ঘাট। ঝিকরগাছায় রেলস্টেশন। স্টিমারে নেবে তিন আনা। এক আনা ভাড়ারও আছে, তাতে ভাল লোক যায় না।

ঝাঁপা এক বেলার হাঁটাপথ। সুবিধা আছে, পিশিমার বাড়ি কাছাকাছি—সেখানে উঠে পুরো দিন জিরিয়ে নেবো। রাত থাকতে বেরুলাম সেজ-দা আর আমি। বাঁশের সাঁকোয়

হরিহর পার হলাম। বাজিকর দড়ির উপরে হাঁটে দেখেছেন? সেই ব্যাপার। দুটো করে বাঁশ ফেলা আছে এপার-ওপার। হাতে ধরবারও ছিল বোধ হয়। সে বাঁশ খুলে পড়ে গাঙের জলে ভেসে গেছে, অথবা খুলে নিয়ে কেউ উনুনে পুড়িয়েছে। অতএব নিচের বাঁশ দু-খানার উপর হিসাব করে করে পা ফেলে পার হবেন। পার হয়েও গেলাম, জলে পড়িনি। পাকা রাস্তা—একটু সেখানে পা ছুঁইয়েই ওদিককার মাঠে নেমে পড়ি। মাঠ, মাঠ —অড়হর-ক্ষেত, লঙ্কা-ক্ষেত। ভূঁইকুমড়ো বেগুন ও শশার ক্ষেত। এক একটা গ্রাম—হাঁসাডাঙা, শ্যামকুড়, রতিন্দে—মাঠের মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন। কচি শশা ছিঁড়ে নিয়ে চিবোচ্ছি। চিবোতে চিবোতে জল তেষ্টা পেয়ে যায়। চল্, আর দু-খানা গ্রামের পর নেংড়ের হাটখোলা। ময়রার দোকান আছে। শুধু জল কেন, মুড়ি-বাতাসা খেয়ে জল খাবি—পেটে ভর থাকবে। মনে হল, এক যুগ ধরে হাঁটছি। সে নেংড়ের হাটখোলা আসে না আর কিছুতে।

তেপান্তরের মাঠের শেষে ক-খানা টিনের চালা। হাটখোলা পেয়ে গেছি অবশেষে। টিনের চালে রোদ পড়ে ঝলমল করছে। মুড়ি-বাতাসা থাক, এক ফেরো জল খেয়ে বাঁচি তো আগে। জল খেয়ে বাঁশের বেঞ্চির উপর খুঁটি ঠেশান দিয়ে জিরোচ্ছি। আবার মাঠে নামতে মন চায় না। আর কি, এসে তো গেলাম রে! ওই যে তালগাছ—ঐখানে পিশিমার বাড়ি। ওঠ্।

মিছে কথা। কত তালগাছ ছাড়িয়ে চললাম। পিশিমার বাড়ি আসে না। হঠাৎ সেজ-দা আঙুল দেখালেন: ঐ দেখ পিশিমা। বাঁওড়ে চান করতে চললেন বুঝি? ডাক দে।

মাঝবয়সি বিধবা একজন। সত্যি বুঝি পিশিমা! উঁহু, পিশিমা এমন নোংরা ছেঁড়া কাপড়ে থাকবেন কেন? এমনি নানান হাসি-গল্পে সেজ-দা পথের কষ্ট বুঝতে দিচ্ছেন না।

ভোঁ-ও-ও করে আওয়াজ দিল কোন দিকে। স্টিমারের সিটি। এসে পড়েছি অতএব কাছাকাছি, আর দেরি নেই। সেজ-দা বলেন, স্টিমার কপিলমুনি চলল ঝিকরগাছা থেকে। কাল ফিরবে, কালকে যাব আমরা।

ঘণ্টা তিন-চার কেটেছে তারপরে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আঁচাতে যাচ্ছি, আবার স্টিমারের সিটি। এবারের আওয়াজটা বেশ আলাদা।

এ কোথাকার স্টিমার সেজ-দা ?

এ হল কুণ্ডলা। ঝিকরগাছা চলল, রাতের ট্রেন ধরিয়ে দেবে।

তবে তো এটাতেই আজ যাওয়া যেত।

ছেলেমানুষের নির্বুদ্ধিতার পিশিমা হেসে উঠলেন ঃ দূর, কুণ্ডলা স্টিমারে ভাল লোক যায় কখনও !

পরে দেখেছি এই কুণ্ডলা স্টিমার। চড়েছিও। প্যাসেঞ্জারের আরামের যত ব্যবস্থা সেই আমলে সম্ভব, সমস্ত ছিল। কিন্তু ভদ্রসজ্জন কেউ চড়বে না, যেহেতু বিলাতি হোরমিলার কোম্পানি ঐ স্টিমার লাইনে এনেছে। কমাতে কমাতে ভাড়া এক আনা করেছে ঝিকরগাছা অবধি। তবু না। শোনা গেল, প্যাসেঞ্জার একেবারে মাংনা নেবে এর পরে। কিছুতেই কিছু হল না, শেষ পর্যন্ত ঐ কুণ্ডলা স্বদেশি কোম্পানিকে বেচে দিয়ে সরে পড়তে হয়েছিল লাইন থেকে। স্বদেশি কোম্পানির মাথায় পি. সি. রায় মশায়। অতি-ছোট্ট একটা স্টিমার চলে তাঁদের—স্টিমার না বলে স্টিম-লঞ্চ বলা উচিত। মাদুর পেতে বসতে হয়। বিলাতি কোম্পানি ঘাটে-ঘাটে প্ল্যাটফরম বানিয়েছে, স্বদেশি স্টিমার সেখানে ধরতে দেয় না। নৌকো আছে স্বদেশি স্টিমারের গায়ে বাঁধা—আঘাটায় দাঁড়িয়ে মানুষে হাত উঁচু করলেই নৌকো গিয়ে তুলে নিয়ে আসে। ঝিকরগাছার ভাড়া তিন আনা অর্থাৎ কুণ্ডলার তিনগুণ।

তা সত্ত্বেও এরা জায়গা দিতে পারে না, মানুষজন গিজগিজ করে। ভিড়ের চোটে একবার ডুবে গিয়েছিল এদের এই ছোট স্টিমার। কুমির ভেসেছিল নদীতে, কুমির দেখতে মানুষ একদিকে ঝুঁকল, স্টিমার কাত হয়ে জল উঠে গেল। এদিকে এই কাণ্ড—আর বিলাতি স্টিমার, দেখুন গে, খা-খা করছে। সস্তা ভাড়ার লোভে দু-পাঁচজন যারা যায়, উপরের ডেকে ওঠে না তারা পারতপক্ষে; নিচের তলায় লুকিয়ে বসে থাকে। ঘাটে নেমেই কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে বেরিয়ে যায়।

প্রথম আমার সেই স্টিমার চড়া। মাঝনদীতে স্টিমার, রেলিং ধরে অগণ্য মানুষ দাঁড়িয়ে—সাঁ-সাঁ করে নৌকো বেয়ে এসে ডাঙা থেকে আমাদের তুলে নিল। স্টিমারে চেয়ার-বেঞ্চির হাঙ্গামা নেই, মাদুর-সতরঞ্চি বিছিয়ে প্যাসেঞ্জাররা বসেছেন। সেজ-দাকে ডাকাডাকি করে, আসুন, এই যে—এদিকে। তাস চলবে তো? তাস, দাবা, পাশা, গানবাজনা—হরেক মজা চলছে। জমজমাট আড্ডা। আমাকেও বলে, বসে পড়ো না খোকা।

খোকার বয়ে গেছে। কত কি বিস্ময়! কলঘরে ঘটাং-ঘটাং বোঁ-বোঁ···কোন যন্ত্র ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনটা মাথা নাড়ছে অবিরত এদিকে-ওদিকে। যত পাগলের কাণ্ডকারখানা। বয়লারের ঢাকনি খুলল—প্রলয়ের আগুন ওর ভিতরে, আগুনের আভায় কালো মানুষগুলো রাঙা রাঙা দেখাচ্ছে। পিছন দিকে প্রকাণ্ড চাকা বিষম জোরে জল কাটছে, জলের গুঁড়ি ফুরফুরিয়ে গায়ের উপর পড়ে। খাসা লাগে। দু-পাশে মাঠ-গ্রাম—বাঁশতলার ঘাটে ছেলেরা জল দাপাদাপি করছে, কলসি ভরছে মেয়েরা, স্টিমার দেখে হাঁ হয়ে থাকে। কেমন সুন্দর খড়ে ছেয়েছে গাঙের ধারের ঘর ক'খানা—এমনি জায়গায় আমাদের বাড়ি হলে রোজ রোজ স্টিমার দেখতাম। ধান কাটছে চাষীরা হাঁটুভর জলে দাঁড়িয়ে। ভোঁ-ও-ও—কোন

ঘাট এটা গো? বাঁকড়া—বাঁক ঘুরে ঘুরে আসছে সেই জন্তে নাকি? এ কোন জায়গা? বল্লা। বেলা পড়ে আসে। সাদ্দিপুর পার হলাম। হাটুরে মানুষ যাচ্ছে নদীর ধার দিয়ে—কাঁধে বাঁক, হাতে ঝোলানো হেরিকেন। হা-ডু-ডু খেলছে ছেলেরা মাঠের উপর। কোন ঘাট এবারে? রামগঞ্জ—এর পরেই ঝিকরগাছা। এসে গেলাম আর কি! লাল রঙের রেলের পুল দেখা যায়, গুম-গুম করে মালগাড়ি যাচ্ছে পুলের উপর দিয়ে। লাল পুল ছাড়িয়ে ওদিকে মানুষ চলাচলের আলাদা পুল—সেকালে কালী পোদ্দার মশায় মায়ের গঙ্গাস্নানের জন্য চাকদা অবধি পথ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, এই পুল সেই সময় বানানো। পৌষ-সংক্রান্তির মুখে চাষীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্থবরে-গান গায়, তার মধ্যে কালীবাবুর কথা আছে—

বকচরেতে কালীবাবু বড় পুণ্যবান,
দেশবিদেশে রাস্তা দিয়ে করেছে খোশনাম।

খুলনা গেলাম একবার স্টিমারে। এক-শ মাইলের কিছু বেশি কলকাতা থেকে। পাকিস্তান হয় নি, কাস্টমসের হাঙ্গামা নেই, ট্রেনে ঘণ্টা চারেক লাগে। সকাল থেকে বৃষ্টিবাদল, বাড়িতে তাই হৈ-চৈ। আপন-জনেরা মাথা ভাঙাভাঙি করছে, নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছে, নয় তো ভরার মধ্যে গোঁয়াতুমি করে বেরোয় কেউ বাড়ি থেকে! কাজকর্মও কিছু নেই যখন, নিতান্ত শখ করে যাওয়া।

টিকিট করে ফেলা হয়েছে, না গেলে টাকাগুলো গচ্চা যায় যে!

প্রাণের দাম টাকার চেয়ে বেশি—

কী বোকা বলুন দিকি! রোজগার করতে হয় না, তাই মুখ দিয়ে বেরুল—টাকা সস্তা, মাগ্যিগণ্ডার প্রাণ। আমরা জানি ঠিক উল্টো।

অতএব ঝড়জল মাথায় করে এক বন্ধুকে নিয়ে জগন্নাথ-ঘাট রওনা হলাম। রেলের চার ঘণ্টার পথ স্টিমারে চার দিন লেগে যাবে—মাথা খারাপ নয়তো আর বলছে কেন? বন্ধুটিও পাকছাট মারবার তালে ছিলেন, পেরে উঠলেন না। ভিজতে ভিজতে গিয়ে চেপে ধরলাম, এবং ট্যাক্সিতে পুরে নিয়ে তুললাম স্টিমারের কেবিনে। দুই উল্টো দিকে দু-জনের কামরা দুটো—মাঝে তক্তার দেয়াল। সারারাত্রি ঝড়বৃষ্টি চলল, পরম আরামে আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়েছি।

স্টিমার কখন ছেড়েছে জানিনে। সকালে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে দেখি, ডায়মণ্ডহারবার শহর পিছনে বাঁকের মুখে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিটা নেই, আকাশ রাগ করে আছে তেমনি। দুপুর হতে না হতেই রাত দুপুরের অবস্থা। চারিদিক অন্ধকার, ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক, নদীজল কালো হয়ে থমথম করছে। আমরা ভাবছি স্টিমার তাড়াতাড়ি কূলে বাঁধবে, কিন্তু নৌশাস্ত্র মতে সেটা অবিধেয়। স্টিমে আরও জোর দিল—যেন স্টিমার দৌড়চ্ছে ভয় পেয়ে। ঝড়ের আগে আগে দুর্যোগ অঞ্চল থেকে ছুটে পালাবে।

আবার সন্ধ্যা এবং রাত্রি। মালের স্টিমার—যাত্রী সাকুল্যে আমরা এই দুটি। সকলে কাজের মানুষ—এত সময় ও টাকা খরচ করে কে আসবে জলজঙ্গলে পাকিয়ে বেড়াতে! সারেং-খালাসিদেরও এমন হয়েছে, মানুষ পেলে বর্তে যায়। খুব খাতির-যত্ন করছে, রাঁধাবাড়া করে খাওয়াচ্ছে। কাছাকাছি হলে রক্ষে নেই, ডেকে বসিয়ে গল্প জমাবে। নিজেদের কথা বলবে, আমাদের ঘর-বাড়ির নানান কথা হাঁ করে গিলবে দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো।

পরের সকালে দেখতে পেলাম, জঙ্গলের ধারে এক চরের উপর আটক হয়ে আছি। ইঞ্জিনের ধ্বকধ্বক আওয়াজ—ক্লান্ত হৃৎপিণ্ডের শ্বাস নেওয়ার মতো। খবর যা পাওয়া গেল—আরে সর্বনাশ!—

হাঁসফাঁসানি এমনটা বিচিত্র নয়। মাঝরাত্রে ঝড়ের মুখে স্টিমার জলতলে যাবার দাখিল হয়েছিল। ঘুমে অচেতন আমরা, একেবারে কিছু জানিনে। বিস্তর যোঝাযুঝির পর এই জায়গায় আনতে পেরেছে। জোয়ারের অপেক্ষায় রয়েছে—তার আগে হাজার মানুষ কাছি বেঁধে টেনেও স্টিমার নড়াতে পারবে না।

তবে দেবরাজের ক্রোধশান্তি হয়েছে। উজ্জ্বল প্রসন্ন রোদ। সুন্দরবনের অগণ্য গাছপালা রোদের মুকুট পরে হাসছে জনহীন নদীকূলে। ছাতের উপর সারেঙের ঘর—সেখান থেকে এপার-ওপারের অনেক দূর অবধি নজরে আসে। সারেঙ ডাকছে, আসেন—হরিণ দেখবেন তো চলে আসেন শিগগির—

কলকল করে কোন আড়ালের কত দূর থেকে জল পড়ার আওয়াজ আসছে। জল সরে-যাওয়া চরের উপর কে যেন নিকিয়ে রেখেছে গৃহস্থবাড়ির উঠানের মতো। হরিণের পাল তার উপর ছুটোছুটি করছে। এমনি সময় আর এক কাণ্ড। হঠাৎ এক ডিঙি ছিটকে এসে পড়ল কসাড় জঙ্গলের ভিতর থেকে। কুমির যেমন ডাঙায় রোদ পোহাতে পোহাতে ঝপাং করে জলে পড়ে। অর্থাৎ ওই যে একটু কলকল আওয়াজ পাচ্ছেন, ভাঁটায় কোন অদৃশ্য পাশখালির জল সরছে। ডিঙি সেখান থেকে এল।

সারেঙ চোখ টিপে বলে, রগড়টা দেখেন মশায়। জলের দিকে ঝুঁকে-পড়ে হুকুম ছাড়ল, ডিঙি বাঁধ্, বেঁধে ফেল্ ঐ জায়গায়—

ওরা যেন শুনতে পায় নি। ঘন ঘন বৈঠা মারছে। সারেঙ হুঙ্কার দেয়, বলা হচ্ছে বাঁধতে—সাহেব এর পর দেওড় করবেন, সেইটে বুঝি ভাল হবে?

ডিঙির মানুষ ভয় পেয়ে গেছে: আমরা কি দোষঘাট করলাম? চিঠি করে তবে তো বাদায় এয়েছি।

কিছু কর নি। সাহেব নেমে একবার দেখে আসবেন।

আমি ভাবছি, সত্যি সত্যি যদি নামতে হয়, সাহেব-লোক এরা কোথা পাবে নামিয়ে দেবার জন্য ? আমি বা আমার বন্ধু কেউ সাহেবের ধারেকাছেও যাইনে—না রঙে-চেহারায় না পোশাক-আশাকে।

কিন্তু দরকার হল না। স্টিমারের গায়ে ডিঙি লাগিয়ে সকাতরে ডাকছে, সারেঙ মশায়, নিচের দিকে আসেন না এট্টু—

সারেঙ আর একবার চোখ টিপে তরতর করে নিচের ডেকে নেমে গেল। ক্ষণ পরে ফিরল, প্রকাণ্ড এক ভেটকিমাছের কানকোয় হাত ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে আনছে। বলে, নজরানা দিল। ভাল একখানা তরকারি বানিয়ে খাওয়াব আজ রাত্রে।

অত ঘাবড়ে গেল কেন ওরা ? কি করেছে ?

তা কি জানি ! করে থাকবে একটা-কিছু। যে আসে, সে-ই কিছু না কিছু করে। আরে মশায়, বাদার বাঘ-কুমির সাপ-শুয়োর কেউ আইন মানে না, ওরাই কি আর ষোল আনা আইন মানতে যাবে !

চার দিনের দিন এক প্রহর রাতে খুলনার ঘাটে নামলাম। ঘাট থেকে স্টেশন ছুটছি কলকাতার মেল ধরব, বাজারের মুখে আধ-অন্ধকার তেমাথা জায়গাটায় হেরিকেন হাতে পাঁচ-সাত জন যথারীতি ছড়া কাটছে···

এরা হল হোটেলের লোক। ভারি মজা করে। শুনুন তা হলে। খুলনা গিয়েছেন কখনো ? ট্রেন-স্টিমার দুটোরই বড় ঘাঁটি খুলনায়। একটা থেকে আর একটায় উঠবেন—তেমাথার উপর দেখতে পাবেন, খদ্দের ধরাধরি করছে। শ্রীকৃষ্ণের শতনাম আওড়ানোর মতো তড়বড় করে রকমারি ব্যঞ্জনের নাম শোনাচ্ছে—আসুন আমাদের অন্নপূর্ণা-হোটেলে—কই-চিংড়ি-ইলিশ তিন রকমের মাছ—ভাজ

পাবেন ঝাল পাবেন ঝোল পাবেন, মুগের ডালের মুড়িঘন্ট, পুঁই-কুমড়োর ছ্যাঁচড়া, চালতের অম্বল—পেট-চুক্তি মাত্র আট আনায়—আসুন, চলে আসুন। আপনি দোমনা ছিলেন, ময়রার দোকানে ছুটো মিষ্টি আর এক গেলাস জল খেয়ে স্টিমারে চেপে পড়বেন—কিন্তু এত সস্তায় রাজসূয় আয়োজনের সংবাদে মন চঞ্চল হল। অন্নপূর্ণা-হোটেল কিম্বা আর্য-ভোজনালয় অথবা বিশুদ্ধ-বিশ্রামনিবাস যারই হোক খপ্পরে পড়ে গেলেন। কোন স্টিমারে যাবেন বাবু মশায়, সাতক্ষীরের? অঢেল সময়। খেয়েদেয়ে দিব্যি খানিক গড়িয়ে যেতে পারবেন। আসুন, আসুন। আলো ধরে হোটেলে ঢুকিয়ে মালিকের জিম্মায় দিয়ে লোকটা ফের খদ্দেরের তল্লাসে বেরুল। সাতক্ষীরেয় যাবেন তো বাবু? বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। ওরে, বাবুকে একখানা পাতা করে বসিয়ে দে—দেরি করিসনে। খেতে বসেছেন আপনি। মাছেরই তিন পদ, আরও কত সব ভাল ভাল তরকারি। আর খুলনার ঘাটে, জানেন তো, অবিরত স্টিমার-রেলের আনাগোনা, কত দিকে কত লাইন। রেলের হোক স্টিমারের হোক সিটি যখন তখন শুনছেন। পাতে সবে ডাল পড়েছে—ঠাকুরকে শিখানো থাকে বোধ হয়—সাতক্ষীরে বললেন না বাবু? ঐ যে শুনছেন, এইবারে তক্তা তুলে নেবে। পরশু একজনে স্টিমার ফেল করে পুরো দিনরাত এইখানে পড়ে। তিন রকমের মাছ ইত্যাদি আপনার মাথায় উঠে গেছে তখন। তাড়াতাড়ি কোন গতিকে হাতমুখ ধুয়ে স্টিমার ধরতে ছুটলেন।

ভুল করেন আপনারা—স্টিমারে যাবেন তো হোটেলে ঢোকেন কি জন্য? ময়রার দোকানেও দরকার নেই। স্টিমারেই কত খাবার! গোয়ালন্দের পথে সেকালে ভাগ্যকুলের ঘাটে স্টিমার

ধরলে রসগোল্লার নৌকোয় ঘিরে ফেলত। তারা শুধু রসগোল্লা বেচে, অন্য কিছু নয়—সে জন্যে এই নাম। স্টিমারের ডেক জল থেকে ধরুন দেড়তলা-দোতলার সমান উঁচু, আর ডিঙিগুলো জলের উপরে। তাই এক কায়দা বের করেছে—লম্বা বাঁশের মাথায় আধ হাত চিরে ফেলে বেত দিয়ে বুনে এমন করেছে, দিব্যি এক মালসা বসানো যায় সেখানে। তারই পাশে বাঁশের গায়ে ছোট্ট এক থলি বাঁধা। মালসা ভরতি রসগোল্লা বাঁশের মাথায় করে তুলে ধরেছে ডেকের ধারে। পুরোপুরি একসের। ইচ্ছে হলে মালসাটা আপনি তুলে নেবেন বাঁশের মাথা থেকে, থলির ভিতর চার আনা দেবেন। বাঁধা দর—এক সের এক সিকি। ধর্ম ভার---ঠিকমতো পয়সা দেবেন, অচল সিকি-দুয়ানি চালাবেন না। ওদেরও সাচ্চা ওজন।

এক বুড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল---এই পথে হরবখত তাঁর চলাচল। জিজ্ঞাসা করলাম, রসগোল্লা ভালো তো?

ভালোই ছিল আগে। এখন মানুষজন শয়তান হয়ে যাচ্ছে, হিসাব মতো মাল দেয় না, ফাঁকিজুকি দেয়।

খেতে খারাপ?

খারাপ বই কি! মিষ্টি কম। চুরি করে বেটারা চিনি কম দেয়, শুধুই ছানা।

অর্থাৎ দুধ বিকোয় তখন এক পয়সা সের দরে। ছানার দাম সেই অনুপাতে। চিনি অনেক বেশি মূল্যবান। রসগোল্লায় ছানাটা বেশি পরিমাণে দিচ্ছে, এই অনুযোগ।

মিষ্টিমিঠাই চিঁড়ে-কলায় না পোষায় তো অন্নব্যঞ্জনও পেতে পারেন স্টিমারে। খালাসিরা যে মুরগির ঝোল রাঁধে, ত্রিভুবনে তার জুড়ি পাবেন না। স্টিমারের পথ শুনলে আমার স্ফূর্তির

অন্ত থাকে না। এবং গিয়েই সর্বপ্রথম কাজ খাবার অর্ডার দেওয়া—রাইস-কারি বানাও।

কালাচাঁদ চৌধুরিকে নিয়ে একবার ভারি মুশকিলে পড়লাম। চৌধুরি ব্রাহ্মণ শুধু নন, কুলীনের সেরা কুলীন—নৈকষ্য। আগের ফুরো দিনটা চিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চোয়ালে ব্যথা ধরেছে—বয়স কম, শরীর ভাল—সকালবেলাই ক্ষিধের চোটে চোখে অন্ধকার দেখছেন।

কি হবে দাদা?

চা-বিস্কুট অঢেল মেলে। কিন্তু প্রাচীন অধ্যাপক-বংশের ছেলে ওসবে মজা পান না। গরম চায়ে জিভ পুড়ে যায়, বিস্কুট বালি-বালি লাগে। আরও শোনা যায়, মুরগির ডিম দেয় নাকি বিস্কুটে।

কি করা যায়? এখনই এই—সন্ধ্যে লাগাত তো মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

খানা দু-জনের মতন বলে দিই না কেন!

রামো, রামো! চৌধুরি জিভ কাটলেন। চালে-ডালে খিঁচুড়ি ঘুঁটে নিতে পারি, তার কোন জোগাড় হয় কিনা দেখুন।

শুনলেন কথা? কাঠকুটো জ্বেলে উনুন ধরাবেন এখন স্টিমারের উপর। বাটনা বাটবেন। তাই হাঁড়ি-কড়াই শিল-নোড়া চাল-ডাল নুন-লঙ্কা সব জোগাড় করে আনো।

চৌধুরির অবস্থা বুঝে চটে উঠলাম: কী রকম শাস্ত্রজ্ঞ আপনি! প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। বিশেষ এই গঙ্গার উপরে—

অতিমাত্রায় পুলকিত হয়ে চৌধুরি বলেন, কি বলছেন—আমরা গঙ্গার উপরে যাচ্ছি নাকি?

নদীর নাম অবশ্য পশর। কিন্তু নদীতে নদীতে যোগাযোগ, এর জলে ওর জলে মিশ খেয়ে যায়—স্টিমারের নিচে গঙ্গার জল নেই, এটাই বা কেমনে বলতে পারেন?

ক্ষিধের জ্বালা অতিরিক্ত হয়েছিল নিশ্চয়—চৌধুরি প্রণিধান করলেন : তা বটে !

তবে আর খুঁতখুঁত করেন কেন ? আমি খাব, আর ব্রাহ্মণ-সন্তান আপনি মুখ শুকিয়ে বেড়াবেন, আমার মোটে ভাল লাগছে না।

চৌধুরি ভেবে বললেন, তবে এক কাজ করুন। মাছ-মাংস নয়—নিরামিষ তরকারি আর ভাত বলে দিন আমার জন্ম। দোষটোষ যা হয়, কলকাতায় গিয়ে ভাল করে গঙ্গাস্নান করলে খণ্ডে যাবে। কি বলেন ?

তাই হল। খেতে বসেছি দু-জনে। ছোট্ট এক টেবিল। আমার জন্ম মুরগি আর উৎকৃষ্ট বালামচালের ভাত। অমৃত এর চেয়ে উপাদেয় নয়। চৌধুরি আলুর ঝোল দিয়ে মেখে ভাত খাচ্ছেন। খুব তারিফ করছেন রান্নার। অবশিষ্ট যা ছিল পাতে উপুড় করতে—আরে সর্বনাশ, আলুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মুরগির ডিম দুটো।

চৌধুরি আগুন হয়ে বলেন, নিরামিষ তরকারি এই ? থুঃ—থুঃ ! জাতজন্ম সমস্ত গেল আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

আমিও বেকুব হলাম। এমন তো কথা ছিল না। কোথায় গেল, ডাক দিকি মিঞাকে।

মিঞা এসে সেলাম ঠুকে বলে, কোন তকলিফ হল হুজুর ?

নিরামিষ তরকারির কথা বলেছিলাম।

তাই তো হয়েছে। গোস্ত দেওয়া হয় নি, মাছও নয়।

কিন্তু ডিম। ডিম ফেটে মুরগি হয়, সেই তো আমিষ হয়ে গেল।

অত হিসেবপত্তোর কি করে বুঝব হুজুর ?

তখন চৌধুরিকে বোঝাই, সর্বনাশ যা হবার হয়েই গেছে। ডিম দুটো ফেলে দিয়ে লাভ কি ?

চৌধুরি বোকা নন, বুঝলেন কথাটা। গুম হয়ে রইলেন একটুখানি। তারপর ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে টপাটপ ডিম গালে ফেললেন। চেটে-পুঁছে খেলেন ঝোলটুকু।

আমার দিকে কটমট চেয়ে বললেন, প্রায়শ্চিত্ত কি এখন বলুন।

নিরামিষ খেয়েও তো গঙ্গাস্নান—ডিমের জন্য না হয় গোটা দুই বেশি ডুব দেবেন। বরঞ্চ আমি বলি—একটা খুনে ফাঁসি, দশটা খুনেও ফাঁসি। কারিটা বেড়ে হয়েছে, কোয়ার্টার প্লেট দিয়ে যাক, চেখে দেখুন।

চৌধুরি হাঁক দিয়ে বললেন, কোয়ার্টার নয়—পুরো প্লেট। আর ভাত।

(৫)

লঙ্কায় যাচ্ছি। রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করে গিয়েছিলেন, সেই ত্রেতার পথেই যায় প্রায় সকলে। ট্রেন-স্টিমার বদলাবদলি আছে এবং সময়ও কিছু বেশি লাগে ; কিন্তু খরচা কম। আর আছে বায়ুনন্দন হনুমানের পথ—একালে অতবড় লম্ফ দিতে না পারুন, প্লেনে সাগর পেরিয়ে সাঁ করে গিয়ে পড়বেন। হাঙ্গামা বিন্দুমাত্র নেই, সময় লাগে অতি কম ; তবে খরচা বেশি।

দু-পথের কোনটাই আমাদের পছন্দ নয়। যাব জাহাজে। খিদিরপুর জেটি থেকে কলম্বো। কান বেড় দিয়ে নাক দেখানো আর কি !

কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জেরবার হয়ে যাচ্ছি। ঘরের কাছে, পরের কাছে। যথা—

এত জায়গা থাকতে লঙ্কায় কেন ?

লঙ্কায় সোনা সস্তা। অনেক সোনা নিয়ে আসব।

স্বর্ণময় আশ্বাসে ঘরের মানুষ হয়তো ঠাণ্ডা করা যায়, বাইরের বন্ধুরা এমন সহজে রেহাই দেবেন না।

জাহাজের পথ কেন?

শর্মাচার্য হাত গুণে বলেছেন, এই বছরে সমুদ্রযাত্রা। বন্ধুজনকে মিথ্যেবাদী বানাই কি করে?

রাতের প্লেনে গেলে কাল দুপুরবেলা সেখানে পৌঁছে ভাত খেতে পারতে

জাহাজে পাঁচটা দিনে বার কুড়িক অন্তত টেবিলে বসে ভাত আর রকমারি জিনিষ খাওয়া যাবে। প্লেনের দুনো ভাড়া দিয়ে তাই জাহাজের কেবিন নিয়েছি।

কি আনন্দ! পাঁচ পাঁচটা দিন জলের উপর ভাসব ডাঙার সঙ্গে সকল সম্পর্ক মুছে দিয়ে। পুরানো পৃথিবী বড় বেশি চেনা—পুরানো পুঁথির মতো, কৌতূহলের কণামাত্র নেই। অথবা প্রবীণা স্ত্রীর মতো—সৌহার্দ্য আছে, অনুরাগ নেই।

ভাগ্যবশে এক ভাল সঙ্গী পেয়েছি—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আসলে তাঁরই সব ব্যবস্থা। আউটরাম-ঘাটে তাঁর সঙ্গে গিয়ে একদিন জাহাজটা দেখে এলাম। ইনচাঙ্গা নাম—শ্বেত-মরালীর মতন আলগোছে জলের উপর ভাসছে। খিদিরপুর ডকের খাঁচায় ঢুকবে নানাবিধ মালমত্রে পেট ভরে নেবার জন্য। তারপর খুশমেজাজে সমুদ্রে বেরুবে। সে শুভলগ্ন কবে আসবে, কিছু তার ঠিকঠিকানা নেই। টমাস কুক বাড়িতে খবর দিয়ে পাঠাবে। অতএব বাক্স-বিছানা বাঁধাছাঁদা করে ঘাটের দিকে এক পা বাড়িয়ে আছি। আর অগাধ সমুদ্রে টহল মেরে বেড়াচ্ছি মনে মনে।

তারিখ এসে গেল। কাস্টমসের হাঙ্গামা চুকিয়ে অবশেষে জাহাজ বোঝাই হয়েছি। মানুষ উঠে গেছে, পাট তোলা কিছু বাকি এখনো। ভর সন্ধ্যা, জেটির ভিড় শেষ হয়ে এলো। দুটো ক্রেন শুধু শ্রান্তিহীন নৈঃশব্দে গাঁটরির পর গাঁটরি জাহাজের খোলে নামাচ্ছে। শেষ নেই, সীমা নেই। ঝুপঝুপে বৃষ্টির ভিতর পাট নিড়াচ্ছে, গাঁয়ে গাঁয়ে দেখেছি। দুর্গন্ধ কালিবর্ণ এককোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাট কাচছে। এখন তারা হয়তো জারির আসরে মশগুল, কিম্বা দাওয়ায় বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক তামুক টানছে। কষ্টের ফসল এদিকে পাচার হয়ে যায় যে লবণ-সমুদ্রের পারে!

শেষ একদল বিদায় দিতে এলেন। উচু সিঁড়ির মাথা থেকে সাড়ম্বরে এসো, এসো—হাঁক ছাড়ি। ডেকে তুলে এনে চায়ের হুকুম দিয়ে দিই। জাহাজ আপাতত আমার ঘরবাড়ি, এক বাড়ির মানুষ হলেও এঁরা এখন বাইরের লোক—ডাঙার উপরের বদ্ধ জীব, অতিশয় করুণার পাত্র। রকমারি পরীক্ষা ও বিচার-বিবেচনা অন্তে ডাক্তার জাহাজে উঠবার ছাড়পত্র দিয়েছেন। বলেকয়ে খাতির-উপরোধে নেমে গিয়ে এক পাক দু-পাক হয়তো ঘুরে আসতে পারি, কিন্তু সেটা আইনদস্তুর হবে না। রোগের জড় চতুর্দিকে ওৎ পেতে রয়েছে—ঘোরাঘুরির মধ্যে, ধরুন, বীজাণু কিঞ্চিৎ সঙ্গে বয়ে নিয়ে এলাম। তা হলে?

শেষ রাতে জাহাজ ছাড়বে, নোঙর ফেলে আছে। দূর-সমুদ্রে যাবার আগে দিব্যি এক ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছে। ইঞ্জিনে ফোঁস-ফোঁস শব্দ—ঠিক যেমনটা ঘুমন্ত লোকে শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়ে।

লাউঞ্জে সদলবলে চা খেতে গিয়ে দৃষ্টি আর ফেরাতে পারিনে। খোদার দুনিয়া অতি বিচিত্র—তবু কিন্তু হেন আশ্চর্য সমাবেশ কদাচিৎ নজরে পড়ে। চারটি মেম সাহেব—আকারপ্রকার ও আয়তন হুবহু এক প্রকার। একই মাতৃগর্ভে এক সঙ্গে গলাগলি

হয়ে না থাকলে এমন সম্ভবে না। চারজনে সেটিগুলো দখল করে বসে আছেন। জাহাজ ওদিকটায় কাত হয়ে গিয়ে কলকল করে তো জল উঠবার কথা। উঠছে না কেন ভাবতে গিয়ে মালুম হল, উল্টো দিকে ভাঙার সঙ্গে শক্তভাবে কাছি করা রয়েছে। এখন যাই হোক রক্ষা হয়েছে—কিন্তু নোঙর যখন উঠবে, অকূল সমুদ্রে জাহাজের উপর বস্তু চতুষ্টয় যখন ঘোরাঘুরি করবেন? বলতে পারেন, বড় বড় পাটের গাইটও তো যাচ্ছে। কিন্তু নির্জীব মালের সুবিধা, ভারসাম্যের হিসাবকিতাব করে যে জায়গায় রেখে দেবেন ঠিক সেইখানে থাকবে। মেম সাহেবেরা তো অমনধারা চুপচাপ থাকবেন না।

আমদের চা দিয়েছে; মোটা মেমদেরও দিল। তাঁরা চা ঢালছেন না—বিরক্ত কথাবার্তা, ব্যস্তসমস্ত দৃষ্টি। কই, আসছে না কেন এখনও? একজনে অধীর হয়ে কাঠের সিঁড়ির দিকে ধাওয়া করলেন। সর্বনাশ—কাণ্ড ঘটল এইবারে একখানা! সিঁড়ির নিচের দিকে দু-জন মিস্ত্রি দেয়ালে বিদ্যুতের বাল্‌ব বসাচ্ছে। ভয়ে ঘেমে উঠি, মরে বুঝি হতভাগারা কাঠের সিঁড়ি ভেঙে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে।

না, বিলাতি জাহাজ—সিঁড়ি মজবুত কাঠে বানানো। মেম সাহেবেরা ওদেরই দেশের তো—পূর্বাহ্ণে সেইসব ভাবনা ভেবে রেখেছে। এমন-তেমন জাহাজ হলে এত ধকল সামলাতে পারত না। মেম সাহেব সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেলেন—এক ছোকরাকে বগলদাবায় নিয়ে পুনশ্চ নেমে এলেন ঐ পথে। আহ্লাদে আরও যেন ফুলে উঠেছেন। সিঁড়ি তথাপি ভাঙে না।

ছোকরাও ডগমগ। হাসতে হাসতে যেই না দেখা দিয়েছে, অপর তিনজনও টেবিল ছেড়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। গাঁয়ে দেখেছিলাম, কাছারির দরোয়ান খাজনার দায়ে ফড়িং কর্মকারকে

ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যতই হাসুক, আমার কিন্তু সেই ফড়িঙের অবস্থাটা মনে আসছে। চারজনে চার দুনো আট হাতে ধরে আছে—অক্টোপাসের কবলে পড়েও হাসতে পারে, ছোকরা বীর ব্যক্তি সন্দেহ নেই।

চা-পানের পর জাহাজময় ওরা টহল দিতে বেরুল। এ পাশে জেঠি, আর ওদিকে দূরবিস্তীর্ণ কল্লোলিনী গঙ্গা। গঙ্গার কূলে দাউদাউ করে একটা চিতা জ্বলছে। তারার আবছা আলোয় ভারি এক আশ্চর্য ছবি দেখছি। এ যেন শহর কলকাতা নয়—সভ্যতা-সীমানার দূরবর্তী এক নতুন জায়গা। পরিপূর্ণ স্বপ্ন-ভূমি—জীবন্ত মানুষের দৃষ্টির মধ্যে আসে না, অন্তত জাগ্রত চোখে তো নয়। চোখ দেখেই না আদপে, দেখতে হয় মন দিয়ে এ জায়গা। আজকের যাত্রামুখে দূর ও নিকটে লোফালুফি চলছে—পরিচিত বান্ধবরা আসছেন যাচ্ছেন কাছাকাছি ঘুরছেন, ডাকছে সুদূর অপরিচয়ের সমুদ্র। এই দোলায়িত মনে বেদনা ও আনন্দের মেশামেশিতে চারিদিকে এমন নতুন রঙ ধরে গেছে।

চমক লাগল। হোস-পাইপে জল ছাড়বার মুখে যেমন আওয়াজ হয়, অবিকল তাই। দার্শনিক চিন্তা চুরমার হয়ে গেল—সর্বনাশ, চার মেমসাহেব সেই দুর্ভাগ্য ছোঁড়াকে আক্রমণ করেছেন। অর্থাৎ ওদের প্রথা মাফিক চুম্বন সেরে ষোল আনা বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন এবার। এই একটি কেবল নয়—আরও তিনজন অপেক্ষমান। পর পর বিদায়পর্ব চলবে, কেউ রেহাই দেবেন না। চুম্বন কি বলি—বাঘে হরিণছানার ঘাড় মটকে ধরে, ঠিক সেই গতিক। বাঘ না বলে হাতী বলতে পারলে বর্ণনা বেশি লাগসই হত। সে যাই হোক, চলে যাচ্ছেন—ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। চার মেম সাহেব নেমে গেলেন—জাহাজ মুক্তির উল্লাসে ইঞ্চি চারেক অন্তত জলের উপর ভেসে উঠেছে, মাপামাপি না করেও

বলা যায়। বাহাত্বর বলি ছোঁড়াটাকে—এত কাণ্ডের পরেও রুমাল উড়াচ্ছে রেলিঙ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। এ লোকের পরিচয় না নিলে চলে না। ব্রাউন নাম, মোমবাসায় যাচ্ছে। আর অধিক আপাতত হল না। ফোঁত-ফোঁত করছে, রুমালে চোখ ঘষে ঘষে রাঙা করে ফেলেছে। আছে পাঁচ-নম্বর কেবিনে—আমাদের পাশেই। তাড়া নেই, কথাবার্তার অঢেল সময় পাওয়া যাবে।

আরও রাত হল। ঘাটের জাহাজ বলে অল্পসল্প আলো দিয়েছে, আঁধার কাটে নি। খালাসিরা নিঃশব্দে আনাগোনা করছে। ডিনারের প্রথম ঘণ্টা—বাচ্চা ছেলেপুলে খাবে এইবার।

যাই তবে?

আমাদের এঁরাও বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে নামলেন। চাঁদ দেখা দিয়েছে দালান-কোঠার ফাঁক দিয়ে। সামনের ফাকা জায়গাটায় ক্রেনের ছায়া। সারাদিন ধরে কত মানুষের আনাগোনা, কত হৈ-হল্লা—আর চাঁদের আলো, দেখুন দেখুন, জেঠির উঠানে যেন আলপনা দিয়ে দিয়েছে। যাচ্ছেন ওঁরা দূরে, অনেক দূরে—ঠিক যেমন জন্মজন্মান্তরের কত আত্মীয়বন্ধু বিস্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেছেন। কাঠের পাটাতনের উপর খটখট আওয়াজ তুলে অলস নৈষ্কর্মে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নিবন্ত চিতায় জল ঢেলে দিয়ে ওপারে শ্মশানবন্ধুরা ধীরে ধীরে ফিরে চলেছে। বাঁকের মুখে ক্রমে ক্রমে তারা আড়াল হয়ে গেল। গঙ্গার এ-কূলে আর ঐ কূলে দুই দৃশ্যের মধ্যে মিল আছে বিস্তর।

জাহাজে ডাক্তারবাবু আছেন। এঁদের দাপটে ডাঙার উপরে তো মরেও সুখ নেই। সমুদ্রে পালাচ্ছি, সেখানেও। শুনতে পেলাম, বাঙালি। যাই তবে, ডাক্তারের ঘরে গিয়ে তোয়াজ করে আসিগে।

ডাক্তার রোগি দেখতে বেরিয়ে গেছেন। যার যে কাজ। এই তো বিকালবেলা যাত্রীরা জাহাজে উঠল, এরই মধ্যে রোগে ধরেছে!

কম্পাউণ্ডার লোকটা বেজার মুখে বলে, ডিনার খেয়েই বমি শুরু করে দিয়েছে। ঘাটের উপরে এই, দরিয়ায় পড়ে তবে তো মশায়, বন্যা বইয়ে দেবে। কিছু না, কিছু না—মুফতে অষুধপত্র মেলে, মনের সুখে তাই খেয়ে নিচ্ছে।

কেবিনে ফিরে এলাম। কেবিন-বয় ভোলানাথ। বয়টির একগাছি দাড়িও কালো নেই—ছবিতে দেখা ঋষিতপস্বীর মতন। নোয়াখালি জেলার লোক। জিজ্ঞাসা করলে পুরো নাম বলবে শেখ ভোলানাথ।

ভোলানাথ বলে, ডাক্তার তো এখানেই এসেছিলেন এই মাত্তোর।

কি আশ্চর্য, আমার কাছে কেন? ডিনার আমায় তো কিছুমাত্র কাবু করতে পারে নি, সমস্তগুলো পদ অবহেলে উদরে ধারণ করে বেড়াচ্ছি। ঘর ভুল করলেন? বাতলে দাও দিকি ভোলানাথ, ডাক্তার সাহেবের চেহারা কেমনধারা। খোঁজ নিয়ে আসি।

জামাজুতো-পরা। জোরে জোরে চলেন। চড়ন্দার লালমুখো সাহেব হলেও ওঁর কাছে খাতির-উপরোধ নেই।

এ মোক্ষম বর্ণনার পরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেখানেই থাকুন নির্ঘাৎ ডাক্তারকে টেনে বের করব। সিঁড়ি দিয়ে নামছেনও বটে এক ব্যক্তি—ধুপধাপ পা ফেলছেন, পায়ে জুতো। এবং জামাও রয়েছে গায়ে—

ডাক্তার সাহেব আপনি?

নেহি, ধোবি—

লণ্ডি আছে জাহাজে। কয়েক ঘণ্টায় কাপড় কেচে দেয়, রোদ-বাতাসের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না। ধোবি ডাক্তারের মতন ভালমানুষ নয়। কাপড় কেচে দিয়ে দাম লিখে রাখে—আট আনা থেকে পুরো টাকা। সবে জাহাজে চড়েছি, পাটভাঙা কাপড়চোপড়, ধোবি চাইনে—ডাক্তার খুঁজছি।

বের করলাম অবশেষে। ডেকচেয়ারে টানটান হয়ে পড়ে আছেন। বয়স বেশি নয়, পাশ করেই জাহাজের চাকরি নিয়েছেন। সপ্তসাগরে আনাগোনা, যাত্রীদের ডেকে ডেকে আলাপ জমান। লিস্টে বাঙালি নাম পেয়েছেন—তবে আর কি! রোগিটাকে তিন রকম পুরিয়া, একটা প্রলেপ ও দুটো মিকচারের ব্যবস্থা দিয়েই আমাদের কেবিনে চলে গিয়েছিলেন।

এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ-মেঘও জমেছে। বললেন, যাত্রীর মধ্যে আপনার নাম দেখলাম। এই নামের একজন কিন্তু—

শশব্যস্তে বলি, সে আমি নই। নামে নামে কতই মিল থাকে। এই ধরুন—ভূপৎ আছে সৌরাষ্ট্রের ডাকাত, আর ভূপতি মজুমদার বছর কয়েক আগেও মিনিস্টার ছিলেন। দু-জনে তাই বলে এক হলেন নাকি? ভদ্রলোকের ছেলে, শখ করে অকূলে যাচ্ছি—নামের মিলে অমনি যা-তা ভাবতে বসেছেন!

লেখেন না আপনি?

তা লিখি, একেবারে লিখব না কেন? মাঝে মাঝে জমাখরচ লিখে থাকি। এক বয়সে দু-দশখানা প্রেমপত্রও লিখেছি। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, এ দুষ্কর্ম কে না করেছে! বেছে বেছে তবে আমারই উপর লেখক বদনাম হবে কেন?

তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার সাহেব পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, বসুন।

এবং এ-গল্প সে-গল্পের পর—

ডিনারে কি কি খেয়ে এলেন বলুন—

বিদঘুটে ফরাসি নাম। অত বুঝি কারো মনে থাকে!

ডাক্তার সাহেব বুক ঠুকে বললেন, আমার আছে। নাম শুধু নয়, কোনটার ভিতর কি কি মশলা—সমস্ত আমার জানা। দায়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। আমার মায়ের হুকুম।

মায়ের কথায় ডাক্তারের কণ্ঠ গভীর হয়ে উঠল: মা আমার বিধবা মানুষ—আচারবিচারের বড্ড ধুম। হুকুম আছে, আর যা-ই হোক—গরু-শুয়োরের তরকারি পাতে না পড়ে। মার কাছে আমি কথা দিয়ে এসেছি।

তারপর বললেন, শুনুন—একটা যুক্তি দিই আপনাকে। আমার খানা আগেভাগে ঘরে দিয়ে যায়। আমি এসে বলে যাব, কোন কোনটা চলবে। টেবিলে তদনুযায়ী অর্ডার দেবেন। এই যেমন আজকের বেগুনের তরকারিটা। খান নি তো? ঠকেছেন, বিষম ঠকেছেন। বড্ড উৎরেছে, জিভে এখনো স্বাদ জড়িয়ে আছে।

ঘাড় নেড়ে বলি, উৎরাবারই কথা। ভীলের পুর দেওয়া আছে কি না!

বলেন কি? তা কক্ষণো হতে পারে না। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন নাকি?

দরকার হয় নি, আপনি এসে বলল। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটি নিরামিষ খান। তাই বলতে এসেছিল, বেগুনই তো প্রায় সব—সামান্য কয়েক টুকরো মাংস, তা-ও কত নরম জাতের জিনিষ। নিরামিষ পাতে ঐ তরকারি চলবে কি না?

ওয়াক-থুঃ, ওয়াক-থুঃ—বলছেন কি মশায়!

ঘাবড়ান কেন? মা-ঠাকরুনকে কথা দিয়ে এসেছেন, সেটা বজায় রয়েছে। পুরোপুরি তো গরু হল না—বাছুর মাত্র।

ডাক্তার বলেন, বাটলার বেটাকে দেখে নেবো আমি। তবু রক্ষে, খাঁটি গঙ্গায় আছি, দোষ তেমন অর্শাচ্ছে না। সাগরে পড়লে কড়াকড়ি করতে হবে।

প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে গেল। জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। জাহাজ চলছে ধীরে ধীরে।

পাড়ের চেহারা অবিরত বদলাচ্ছে। দেখছেন ঐ নারিকেল-খেজুরে ঘেরা ঘর-বাড়ি। তার পরে এলো মসজিদ, আমবাগান। গ্রাম ছাড়িয়ে এলাম তো ধানক্ষেত। ক্ষেত, ক্ষেত—ক্ষেতের আর অন্ত নেই। নৌকোর পর নৌকো চলেছে গদাই-লস্করি চালে। ভেসে চলেছে শেওলা। সূর্য উঠছে। রোদ পড়ে গঙ্গার ঘোলা জল রূপার পাতের মতো ঝিকমিক করছে। জন-কল্লোলিত শহর ছেড়ে এ আমি কোন জগতে এসে পড়লাম। শ দুই-তিন হাত দূরেই ডাঙা। তবু কি অপার প্রশান্তি এই জায়গাটায়! জীবন-সংঘর্ষের খরতাপ এই জলটুকু পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি—ডাঙার মধ্যেই আটকে রয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া শরীর-মন জুড়িয়ে দিয়েছে, এতটুকু জ্বালার অবশেষ নেই।

ডেক মাজাঘষা করছে, রাগ হচ্ছে বিষম। তাড়া কিসের বাপু, গড়াও গিয়ে আরও খানিকক্ষণ। মানুষজন উঠে পড়ে হৈ-চৈ শুরু করে দিক, তখন যা করবার কোরো। ইঞ্জিনের ফিসফিসানি, জলের ক্ষীণ কলধ্বনি। দার্শনিক চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনি কত বিচিত্র পরিবেশ পার হয়ে জঙ্গম জীবন দিন অতিবাহন করে ছুটেছে। তারও লক্ষ্য এমনি কি সুনির্দিষ্ট? দুলছে জাহাজ এদিকে-ওদিকে—জীবনেও এমনিধারা কত আন্দোলন!

কোঁকড়া-চুল ফুটফুটে এক মেয়ে ঘটর-ঘটর করে পেরাম্বুলেটার ঠেলতে ঠেলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। একটা বড় পুতুল পেরাম্বুলেটারে। পুতুলের লম্বা চুল দু-পাশে থোপা-থোপা হয়ে পড়েছে—ঠিক ঐ মালিকটির মতো।

হনি!

এই যে মা—

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে মেয়েটা গাড়ি থামাল। সোনালি চোখের তারা মেলে আমার দিকে এক নজর চায়।

তুমি হনি? বেশ নাম, অতি চমৎকার নাম।

ফড়ফড় করে সে একগাদা জবাব দিয়ে দিল, হনি নয়, আমার নাম হল হেলেন। এই আমার পুতুল। বাবা হংকঙে থাকে, মা আর আমি যাচ্ছি সেখানে।

মা এসে পড়লেন।

ব্রেকফাস্টে চলে এসো হনি।

এক হাতে মায়ের স্কার্ট জড়িয়ে ধরেছে, আর এক হাতে পেরাম্বুলেটার। মায়ের সঙ্গে বকবক করতে করতে হনি চলে গেল।

নদী খুব চওড়া এখানটায়, একটা বড় খাল বেরিয়ে গেছে। বার কয়েক হঠাৎ সাইরেন বেজে মাঝ বরাবর জাহাজ থেমে দাঁড়াল। আবার নোঙর নামাচ্ছে। ভোলা মিঞা খুটখাট শব্দে কেবিনের কাজে আছে। ব্যাপার কি ভোলানাথ, দু-কদম এসেই তোমাদের জাহাজ হাঁপিয়ে পড়ল?

ভোলানাথ বর্তে গেছে। ডি-ল্যুক্স কেবিনের যাত্রী হয়েও এমন ডেকে ডেকে কথা বলছে। বলে, জায়গাটা হুজুর বড্ড খারাপ। এককালে ডাঙা ছিল, বান এসে সমস্ত গাঙে ঢুকিয়ে নিয়েছে। পানি তাই বড্ড কম, ভাঁটি সরে গিয়ে এখানে-ওখানে দেখুন মাটি বেরিয়ে গেছে। কখন কোথায় আটকে যাবে ঠিক নেই। জোয়ার

যতক্ষণ না আসে থাকক এইভাবে বসে। জোয়ার বাড়লে পাইলট এসে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

যতদূর নজর চলে, নিঃসীম চর মরুভূমির মতো খা-খা করছে। গাছপালা বাড়িঘরের চিহ্ন নেই। বাঁধের উপরে একটা শুধু নিষ্পত্র ঝাড়াসেজির গাছ—নিঃসঙ্গ গাছের গোড়ায় ছলছল করে লক্ষ লক্ষ ঢেউ লুটোপুটি খাচ্ছে।

ভোলা মিঞা আঙুল দেখায়ঃ ক্ষীরি জেলেনীর ঘাট হল ঐখানটা—

ঘাট-টাট কই কিছু তো দেখিনে। মানুষ-জন নেই, তার ঘাট!

তবু হুজুর ডাক রয়েছে ঐ রকম। সেকালে মানুষ ছিল, মস্ত এক পাড়া ছিল।

দেখেছ তুমি? জাহাজের চাকরি কদ্দিন হল ভোলানাথ?

লেখাজোখা আছে কি হুজুর! একেবারে বালক তখন। কাজ ছিল, জাহাজের যত পিতল ঘষে ঘষে চকচকে রাখা। কত দরিয়ায় ঘুরলাম হুজুর, ঘরদুয়োরে এখন মন টেঁকে না। দু-মাস দেশে গিয়ে আছি তো দরিয়া যেন হামলা ছেড়ে ডাকতে লাগে।

এই যেখানে নোঙর করে আছেন, এটা জেলেপাড়া। যেমন-তেমন পাড়া নয়, হাঁক পাড়লে একশ' মরদ বেরিয়ে আসবে। ভোলানাথ নিজে না দেখুক, স্বচক্ষে দেখা ছিল বুড়ো সারেং আবদুল আলির। বুড়ো ক'বছর আগে মাটি নিয়েছে, নইলে ডেকে এনে তার মুখ থেকে শুনিয়ে দিতাম হুজুর।

তা কি হয়েছে! আবদুল যখন নেই, তুমি বললে কিছু কমজোরি হবে না। তারই মুখে শুনেছ যখন।

কাজকর্ম নেই, ডাঙার মতন আড্ডাগুলতানিও হচ্ছে না। গল্পের গন্ধে ছেঁকে ধরলাম। কিন্তু এক্ষুণি বসে পড়লে তো চাকরি থাকবে না। খাতিরে নেহাৎ না বলতে পারে না, দু-এক কথায়

সেয়ে দিয়ে সরে পড়ল। আমার অঢেল সময়—ভোলা মিঞার ছাড়া-ছাড়া গল্প জমে মিশে কেমন মূর্তি ধরে আসছে।

যেখানটায় রয়েছি—জল নয়, এটা খটখটে ডাঙা। বেশ, ধরে নিলাম তাই। খোড়ো ঘর গাদাগাদি হয়ে আছে—এর উঠান দিয়ে ওর ঘরে যাবার পথ, ওর কানাচে এর রান্নাঘর। তারই এক ঘর-উঠোন নিয়ে ডাগরডোগর বউটা—আমাদের ক্ষীরোদা জেলেনী। বিয়ে হয়েছিল কোন এক যুগের কথা—তখন বকেঝকে মার-গুতোন দিয়ে বরের ঘরে পাঠানো যেত না। ঢুকিয়ে দেওয়া হল জো-সো করে; দুয়োর বন্ধ করে বর শুয়েছে, একটু ঝিমুনি মতো এসেছে, নতুন বউ টিপিটিপি খিল খুলে ফুড়ুৎ করে পাখির মতন বেরিয়ে যায়। ধর্ ধর্—কোথায়? হয়তো বা কলাবনে কাঁচকলা-ঝাড়ের ভিতর বসে পড়েছে। কিম্বা পোয়ালগাদার নিচে। কেউ খুঁজে পাবে না। তখন কাতর হয়ে ডাকাডাকি—ওরে ক্ষীরো, চলে আয়। উড়োকালে মা-মনসাদের চলাফেরা—আর কেউ তোকে ঘরে যেতে বলছে না।

আর এখন দেখুন, সোমত্ত বউটার কাণ্ড। বাপের বাড়ি যাবে, তা-ও নানান অজুহাত। পাল-পার্বণে ক্রিয়াকর্মে ভাই এসে নিয়ে গেলে একটা দিন থেকেই অমনি যাই-যাই করে। ওরা বলে, বাপের বাড়ি জল-বিছুটি মারে ক্ষীরিকে। ক্ষীরি না-না—করে, কিন্তু চলে আসে ঠিকই একটা দিন দুটো দিনের ভিতর।

জাল-নৌকো নিয়ে মরদরা গাঙে বেরোয়, বিলে বেরোয়। বাইতে বাইতে অনেক দূর চলে যায়। ডিঙি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ছোট, আরও ছোট। বাঁকের আড়ালে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়।

শেষটা কি হল—পুরুষকে আর গাঙে যেতে দেবে না ক্ষীরি। তিলেক ছেড়ে থাকতে পারে না, ভয় করে। এ নিয়ে খুব হাসি-

মস্করা পাড়ার মধ্যে। বউয়ের আঁচল-ধরা বলে পুরুষেরও নিন্দে রটে যাচ্ছে। আর যা বলে বলুক, কিন্তু জোয়ান-মরদ মেয়েমানুষের গোলাম, এ গালাগালি সহ্য করা যায় না।

পূজোর সময়টা—অষ্টমী-নবমী তিথি, বছরের সেরা গোন হল এই সময়টা। মাছ যেন মুকিয়ে থাকে জালের নিচে পড়বার জন্য। আর বাজারও ভাল। পাড়ার মধ্যে, তাই দেখ, সকলে বেরিয়ে গেছে—আছে শুধু মেয়েলোক আর বাচ্চাবুড়ো। তোমার আঁচলের তলায় পায়রার মতন বকম-বকম করলে তো পেট ভরবে না ক্ষীরো। ঠাকুর-ভাসানোর দিন আবার এক মোটা খরচ রয়েছে।

সন্ধ্যার মুখে ভারি মেঘ করে এলো। বাতাস নেই কোন দিকে, মেঘের ছায়ায় থমথম করছে স্থির নদীজল। ঐ যে কাঠের ভরা বাঁধা আছে—ভেবে নিন, ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ক্ষীরি। তাকিয়েছিল গাঙ আর গাঙপারের বিলের দিকে। অনেক দূরে জলের উপর যেন ক্ষীণ কয়েকটা কালো বিন্দু। ফিরে আসছে নৌকোগুলো আকাশের গতিক দেখে? সত্যি বটে তো—না, চোখের ভুল?

কড়কড় দেয়া ডেকে উঠল। উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়ার দাপাদাপি। ঘন কালো মেঘ বিদ্যুতে এফোঁড়-ওফোঁড় করছে। অযুত কোটি সৈন্যের মতো ধেয়ে আসছে জলরাশি। ডাঙার উপরে আক্রোশ, আক্রোশ মানুষের উপর। নিঃসীম বিলের মাঝখানে জেলে-ডিঙিগুলো হাওয়ার দাপটে ছড়িয়ে পড়েছে—এখানে একটা ওখানে একটা, লক্ষ্যহীন ছুটোছুটি করছে। কল্পনা করুন, ছবিটার আন্দাজ নিয়ে নিন। ক্রুদ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার নামে মানুষ আর্তনাদ করছে, ক্ষমা দাও দেবরাজ, দোষ-গুণাহ্ মার্জনা করো। জবাবে হুঙ্কার আসে উপর থেকে, খলখল ঠাট্টার হাসি হাসে নিচের জলতলে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঝড়ের নদীতে যদি কখনো

পড়ে থাকেন স্পষ্ট শুনতে পাবেন হাস্যধ্বনি, প্রসন্ন জলের এই কলরবের সঙ্গে তার কোনরকম মিল নেই। স্ফূর্তিতে গলে গলে পড়ছে জলের নিচে কারা যেন; অধীর হয়েছে নতুন শিকারের আশায়। হয়তো বা ক্ষুধিত দৃষ্টি তুলে জলের উপরে দেখে নিচ্ছে এক-একবার। কত বাকি, কত বাকি আর এখনো!. সবুর সইছে না তাদের।

আর ঐ কাঠের ভরার ঐ জায়গাটা সেকালের নদীতীর যদি হল, আমাদের ক্ষীরির চেহারাটাও ভাবুন ওখানে। আলুল চুল উড়ছে, পাগল হয়ে ছুটছে বউ বালুর উপর দিয়ে। কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবু আকুল হয়ে চেঁচাচ্ছে, এসো গো, ফিরে এসো তুমি—

সে রাত্রে জেলেপাড়ায় একটা নৌকো ফিরে এলো না। পরের দিন এলো কেউ কেউ। তারও পরে পাওয়া গেল ক'জনকে—পচে ফুলে ঢোল হয়ে বিকৃত বীভৎস মূর্তি ভেসে উঠল জলের উপরে। কিন্তু ক্ষীরি যাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত, জল থেকে উঠল না সে কোন দিন।

একমাস দু-মাস করে কত দিন কেটে গেল। কী কাণ্ড, একদিন নদীর কূলে ছুটে ছুটে কত করে ডেকেছিল—এখন নদীর কাছে আসতে ক্ষীরির ভয় করে। নদী ডাকে। নদীর নিচে বিস্তর কণ্ঠের ধ্বনি—তার মধ্যে ক্ষীরির মানুষটিরও গলা। যাকে ছেড়ে যে এক লহমা থাকতে পারত না। জলের গম্ভীর বিচিত্র ডাক একাই কেবল শুনতে পায় বউটা। আরও অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখেছে। আর কেউ নয়—সে একলাই শুধু শোনে।

তারপরে একবার ভীষণ বান ডাকল। জল ধাওয়া করল ডাঙায়। পণ করেছে, ধরিত্রীর চিহ্নমাত্র থাকতে দেবে না, সমস্ত ভাসিয়ে নেবে। জল গজরাচ্ছে, হাজার হাজার ক্ষুধার্ত জানোয়ার

খ্যা-খ্যা করে বেড়াচ্ছে যেন। পাড়াসুদ্ধ নৌকোয় উঠে পড়ল, ক্ষীরিকে তোলা গেল না কিছুতে। এত শত্রুতা জলের সঙ্গে, তার বুকে ভেসে পড়বে কোন ভরসায়? নৌকোয় না উঠে সে উঠোনের বাতাবিনেবু-গাছের দোডালায় চড়ে বসল। শাড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বাঁধল নিজেকে। দোডালা অবধিও জল উঠলে টানের চোটে যাতে ভেসে না পড়ে, জলের পাতালে ডুবে না যায়। হলও তাই। বাতাবিনেবু-গাছ উপড়ে গেল বন্যায়, গাছ ভেসে ভেসে চলে গেল অনেকখানি দূর। ক্ষীরি মারা গেল। কাপড় দিয়ে সর্বদেহ বাঁধা তো আছেই—আর পরমাশ্চর্য ব্যাপার, কঠিন মুঠোয় সে মাটি আঁকড়ে আছে। সে মাটি মুঠো খুলে ছাড়ানো যায় না। মরা মানুষের আঙুলে এমন জোর! মাটি সে ছাড়বে না, কিছুতে নয়। মনের সকল একাগ্রতা আঙুলের মুখে যেন মাটি আঁকড়ে ধরে আছে……

বোতামটা পরিয়ে দাও না—

মোহানার জল ও কাঠের ভরা থেকে দৃষ্টি জাহাজে ঘুরে এলো। জলের উপরে ডাঙা বানিয়ে দিব্যি যে গল্প জমে আসছিল, আবার তা ভঙ্গ হয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটা গলা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, জামার বোতাম পরিয়ে দিতে হবে। হনি নয়, সেই বয়সী আর একটি। পুতুলের সেই পেরাম্বুলেটার ঠেলে ঠেলে বেড়াচ্ছে।

বেবি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

ঘাড় দুলিয়ে মেয়েটা বলে, হ্যাঁ, আমি ঘুম পাড়িয়েছি। দেখ কত ভালবাসে আমায়। আমার কাছে এসে কাঁদে না, কিচ্ছু না। ঠাণ্ডা হয়ে কেমন ঘুমিয়ে থাকে।

গাড়িটা তো হনিরই। তার সঙ্গে বড্ড ভাব বুঝি তোমার? পুরানো জানাশোনা?

তা পুরানো হয়ে গেল বই কি! কাল সন্ধ্যাবেলা খাবার-টেবিলে ভাব হয়ে গেল। দু-জনেই আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। তার বাবা হংকঙে থাকেন, আমার বাবা ত্রিয়েস্তে। হনিরা কলম্বোয় নেমে যাবে। আমরা বরাবর চললাম।

এক ফোঁটা মেয়েটার সমুদ্র যেন নখদর্পণে। বলে, উই যে পাইলট-লঞ্চ এসে গেল। জাহাজ ছাড়বে এবারে।

লঞ্চ জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল। তাড়াহুড়ো লস্করদের মধ্যে। নোঙর উঠছে।

হনি এলো নাচতে নাচতে।

মারিয়ার সঙ্গে তোমার বেবির কত ভাব হয়ে গেছে, দেখ হনি। ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। বেবি ওকে বড্ড ভালবাসে, ওর কাছে কাঁদে না।

হনির ঝিকমিকে মুখ কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বলে, বেবি বলছ কাকে? এ তো ডল আমার—

মারিয়া জেদ ধরল, না—বেবি।

আমার জিনিস—আমি জানিনে ডল-কিম্বা বেবি? তুমি তাই আমায় শিখিয়ে দেবে?

এক ঝাঁকিতে মারিয়ার হাত থেকে পুতুল সমেত গাড়ি নিয়ে হনি চলল। গড়গড় গড়গড় করে সারা ডেক ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। মাটির বাঁধন ছেড়ে দিয়ে চললাম। ক্ষীরি জেলেনি নই, জলকে আমরা ডরাইনে। অকূল সমুদ্র কতদূর?…

(৬)

সীমাহারা নীল জল। আঃ বাতাস, অত জোরে কেন, খাতার পাতা ফরফরিয়ে ওড়ে, লিখতে পারি না যে! সমুদ্র শান্ত। খুব বড় এক দীঘির উপরে সাঁতার কেটে চলেছি যেন। দোলাচ্ছে আমাদের কোলের শিশুর মতো, জাহাজ কেমন ছোট্ট বয়সের দোলনা হয়ে গেছে! হাজার মাইল থেকে বাতাস ছুটে এসে মোলাকাত করছে, খেলা করছে—আর এই দেখুন, খেপাচ্ছে। ক'খানা ডেকচেয়ার খালি পড়ে আছে—বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে নাচাচ্ছে সেগুলো। যাও না বাপু, ওধারে নাচিয়ে এসো, দেখি মুরোদ কতদূর! পাহাড় চাপা আছে ঐসব চেয়ারে। এক এক মহিলা। ডাঙায় যা ছিলেন—জলে এসে, মালুম হচ্ছে, ডবল ফেঁপে উঠেছেন। খাবার-টেবিলে সবগুলো পদ একনাগাড়ে অর্ডার দিয়ে যান—প্রায় কিছু বাদ দেন না। পয়সার বস্তু নিষ্ফলে যাবে না তো! এক-একটা বই মুখে দিয়ে আছেন ওঁরা—স্বল্প মূল্যের সাধারণ ক্রাইম-নবেল। চোখের সামনে অবাধ সমুদ্র, আর অপরূপ রৌদ্র। দিগন্তের এখানে-সেখানে মেঘ ছড়ানো। মেঘ নড়ে না—প্রায় আমাদেরই মতন। নানান সাজে সেজে গা এলিয়ে আছে। বরফের পাহাড়, কিংবা পেঁজা-তুলো গাদা হয়ে আছে। তার পাশে লাল পাথরের প্রকাণ্ড দুর্গ—ভাঙাচোরা, সর্ব অঙ্গ জুড়ে প্রাচীনতার চিহ্ন। রাজপুতানায় ট্রেনে যেতে যেতে হামেশাই যেমনটা চোখে পড়ে। কিন্তু দেখাই এসব কাকে? ওঁরা পণ করেছেন, কোন-কিছু চেয়ে দেখবেন না। দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাজে ঝামেলা পাছে মনে ঢুকে পড়ে, গোয়েন্দা উপন্যাসের ঠুলি পরে পরম সাবধানে আছেন।

কমলানেবু পকেটে উঁচু হয়ে আছে। ব্রেকফাস্টে ফল দেয়। ছাঁদা বাঁধা পুরনো অভ্যাস। ছেলেবেলা ভোজ খেতে গিয়ে পেটে আর ধরছে না—হাত বাড়িয়ে দিই, সন্দেশগুলো দাও দিকি, বাড়ি গিয়ে আয়েস করে খাওয়া যাবে। সেই লোক আমি। টেবিল থেকে বেমালুম পকেটে ফেলেছিলাম, লাঞ্চের পরে ডেক-চেয়ারে আলসে শুয়ে শুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি জলে।

খবরদার!

গডউইন এসে হাত এঁটে ধরল। বেঁটে মোটা চতুষ্কোণ চেহারা। সার্জেন্ট গডউইন—এই নাম দেখেছি যাত্রীর লিস্টে। খটখট খটখট ভারী বুটের আওয়াজ তুলে উপর-নিচে পাক দিয়ে বেড়ায়। খাওয়ার পরে এই ভর দুপুরেও বিরাম নেই। নেবু সুদ্ধ আমার হাতখানা যেন ছোঁ মেরে ধরে ফেলল।

খবরদার, খোসা জলে ফেলো না। সিগারেটের টুকরোও না পড়ে যেন জলে।

হো-হো করে উদ্দাম মিলিটারি হাসি হেসে সে পাশের চেয়ার দখল করে বসল।

জাহাজটা এস. এস. অর্থাৎ স্টিম-শিপ নয়—এম. ভি.—মোটর-ভেসল। শৌখিন চেহারা, রাজহংসের মতো সাদা রং, ধোঁয়া নেই, বদখত আওয়াজ নয়। জাহাজ কি বাড়ি ভুল হয়ে যায়। ঘুম ভাঙার পর কয়েক মিনিট তো মনেই পড়ে না আমার।

গডউইন বলে, লড়াইয়ে ইনি বিষম জখম হয়েছিলেন। অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন মানোয়ারির বহর এসে পড়ায়। আজকের এই বাবুয়ানার মধ্যে সে ক্ষতের এতটুকু দাগ নেই। শোন, নিয়মগুলো জেনেবুঝে রাখ, যদি কখনো তেমনি দিন আসে। সিগারেটের টুকরো কি নেবুর খোসা ফেলবে না সমুদ্রের জলে। সাবমেরিন হয়তো ঘাপটি মেরে আছে, ঐ থেকে জাহাজের নিশানা টের পেয়ে

যাবে। রাত্রিবেলা আলো জ্বালবে না কখনো ডেকের উপর, সিগারেট খাবে না। দুশমনের নজর বড্ড ধারালো।

হেসে উঠে অত হাওয়ার মধ্যেই একটু হাতের আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরাল। এ সিগারেট জাহাজে ভারি সস্তা, ডাঙায় বিষম দাম। পাবেন না সহজে—ডাঙার ট্যাঁকে অত বিলাসিতার ভর সয় না।

লড়াইয়ের সময় জাহাজের ছিল মেটে রং। পোর্টহোলের মুখটাও আলকাতরা মাখিয়ে কালো করে দিয়েছিল। কালো পর্দা ঝুলত চারতলার ডেকে, যেখানে কাপ্তেন ও চীফ-অফিসার আছেন। তেতলা—দোতলাতেও প্রায় ঐ ব্যবস্থা। দিনমানে এদিক-ওদিক দেখেশুনে ঘণ্টাখানেক শুধু পোর্টহোল খুলে দিত জাহাজের কন্দরে খানিক বাইরের হাওয়া ঢুকিয়ে নেবার জন্য। তখনই আবার সব বন্ধ। বলা তো যায় না,—কখন টর্পেডো এসে পড়ে! সমুদ্রে আমরা লুকোচুরি খেলে বেড়াতাম। এমনি হাসিহল্লা আর রাত্রিবেলার অত আলো, ঈশ্বর, ভাবতে পারতাম তখন কেউ?

আধেক-খাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলতে লাগল, তবু কিন্তু নজরে পড়ে গেলাম। ইউবোট জখম করে দিয়ে পালাল। বহর পিছনে ছিল, তাই পালিয়ে গেল—নয়তো একেবারে শেষ করত। জন কুড়িক ঘায়েল হয়েছিল। পুরোপুরি মরে নি হয়তো সবাই, কিন্তু বাছাবাছির সময় কোথা? কুড়িটাকে জল-সই করে এবং কিছু মালপত্তোর ছুঁড়ে ফেলে জাহাজ হালকা করা হল। নয়তো যায় তলিয়ে সব সুদ্ধ—

লড়াই করে করে লোকটার মায়ামমতা নেই। যেন বইয়ে পড়া কোন সেকালের গল্প বলছে। এক জায়গায় বসা ধাতে সয় না, এইটুকুতে হাঁপিয়ে পড়েছে—তড়াক করে উঠে খটাখট বুট বাজিয়ে আবার সে চলল।

নোয়াখালি জেলার বাসিন্দা কেবিনবয় ভোলা মিঞা ফাঁক পেলে কাছেপিঠে ঘুরঘুর করে, একটা কথা জিজ্ঞাসা না করতে বিশ কথার গল্প ফেঁদে বসে। ছ-মাস জাহাজের কাজ, তারপর তিনমাস বাড়ি গিয়ে বসে থাকা। বউ-ছেলেপেলে আর ঘরসংসার সামলানো—সে যে কী বখেড়া, আপনি বুঝতে পারবেন না সাহেব (যেহেতু সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী, কৃষ্ণবর্ণ এবং ধুতির পোশাক সত্ত্বেও সুনিশ্চিত সাহেব)। ডাঙার উপরটা মোটে চেনাজানা নেই, গ্রামটুকুর বাইরে গেলেই গোলকধাঁধা। আসলে আমরা হলাম দরিয়ার জীব—নজর ফেলেই বলে দেবো, কোন জায়গা দিয়ে কত নটে যাচ্ছি। গোলা মেরে জাহাজ জখম করে দিয়ে গেল, সে হুজুর একবেলারও পথ নয় এখান থেকে। ও বেটার শোনা গল্প, ও কোথায় তখন? আমি ছিলাম। আমি চোখের উপর দেখেছি। ম্যানহোলের ফাঁক দিয়ে মরা-আধমরা লস্করগুলোকে দরিয়ায় পাচার করল। আমারই চোখের উপরে।

ব্যাপারি জাহাজ, মাল বওয়াবয়ি করে—এদিকটায় লড়াইয়ের ডামাডোল নেইও তেমন, নিরুদ্বেগে চলেছে। কাপ্তেন রবার্টস্ ঝানু লোক, জাহাজি কাজ ওদের তিনপুরুষ ধরে। সে রাত্রে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, ঠিক যেন দিনমান। ব্রিজের উপর ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে, মুখ তার কঠিন হয়ে উঠল। অভিজ্ঞ সন্ধানী দৃষ্টি, ঠিকই সন্দেহ করছে। চীফ-অফিসার ও চীফ-ইঞ্জিনীয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে এলো সেখানে। তাই বটে, ইউবোট—

গোলা এসে পড়ে। বিষম এক টাল খেয়ে জাহাজ কোন গতিকে সামলে নিল। হাতিয়ার নেই, লড়বার কথাই ওঠে না। ইউবোট থেকে হুকুম আসে, বন্ধ করো ইঞ্জিন—। কিন্তু রসদপত্র দুশমনের হাতে তুলে দেওয়া যায় কি করে? খুব বেশি তো সাড়ে তেরো নট ছুটতে পারে এ জাহাজ। আর ইউবোট কমপক্ষে ষোল। ইঞ্জিন-

ঘরে চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নিজে ঢুকে পড়ল। চোদ্দ নটে তুলেছে। সাড়ে-চোদ্দ। গতিবেগে থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে। হল না, পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল। গোলার ঘায়ে, কি জানি, সাইরেন-যন্ত্রের চোঙ এক জায়গায় বিগড়ে গেল। একটানা বেজেই চলেছে। সে আওয়াজ বন্ধ করবার জো নেই। অকূল সমুদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম আর্তধ্বনি। টলমল করতে করতে জাহাজ আস্তে আস্তে জলতলে নেমে যাচ্ছে। আর দু-একটা তোপ পড়লে রক্ষা ছিল না, কিন্তু কাছাকাছি ধোঁয়া দেখে ইউবোট সাঁ করে সরে পড়ল। লাইফবোট নামিয়ে তখন জ্যান্ত মানুষ সরানো হচ্ছে, বাতিল মালপত্র ও মড়া ছুঁড়ে ফেলে ভার কমানো হচ্ছে।

ভোলা মিঞা বলে, চোখে পানি এসে যায় সেদিনের কথা মনে পড়লে। জায়গাটা এই কাছেপিঠে কোথাও। এইখানটায় নয়, এমন কথাও হলপ করে বলতে পারিনে। দরিয়ায় সঠিক নিশানা কে করবে হুজুর ?

ভোঁ-ও-ও—করে একটা জোর ভেঁপু। একটুখানি থেমে সাতটা ব্লাস্ট পর পর। তাই তো, ঘড়িতে পাঁচটাই এখন। লাইফ-জ্যাকেট পরে ফেলুন তাড়াতাড়ি। গিয়ে দাঁড়ান আপনার যে লাইফবোট, তার কাছে। নোটিশ-বোর্ড দেখুন, আপনার বোট দু-নম্বরের। চলে যান। কাপ্তেন নেমে আসবে, চীফ-অফিসার এসে রোল-কল করবে। এটা মহড়া। সত্যি সত্যি জাহাজডুবি হলে হুড়োহুড়ি না করে যাতে কেউ। চরম সময়ে শান্তভাবে নিজ নিজ জায়গা নেবে।

লাইফবোটের পাশে মেয়েপুরুষ গিয়ে লাইনবন্দি দাঁড়াল। খালাসিরা অবধি। এ যজ্ঞে সকলের নিমন্ত্রণ। অর্থাৎ মোটামুটি স্বীকার করা হল, পঞ্জরের নিচে প্রাণ নামক মূল্যবান বস্তুর

অধিকারী সকলেই। জেন স্টানলির কামরা ঠিক আমার সামনে। ব্রাউন ছোকরার সঙ্গে আজ সকালে বিষম একচোট হয়ে গেছে। কমবয়সি ঝিকমিকে মেয়ে—প্রসাধনে অতএব সময় কিছু নেবেই। ব্রাউন অতশত বোঝেনি। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা পড়ে গেছে. বাইরে পায়চারি করছে সে অনেকক্ষণ। ওরা এক টেবিলে বসে, সমুদ্রের হাওয়া ক্ষিধেটাও খুব বাড়িয়ে দিয়েছে সম্ভবত। না পেরে শেষটা তাগিদ লাগাল, হল তোমার? কতক্ষণ চলবে রে বাপু! জবাবে বিষম এক দাবড়ি। সেইখানে চুকে গেলেও ছিল ভাল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা রীতিমত সঙিন হচ্ছে। লাঞ্চের সময় ঠাহর করলাম, ব্রাউন একা একা মন-মরা ভাবে সুপ খাচ্ছে, জেন ওদিককার এক ফাঁকা টেবিলে। সেই জেন আর ব্রাউনকে দিয়েছে একই লাইফবোটে—চীফ-অফিসারের রসিকতা কিনা বুঝলাম না। পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়েছে—তা বিষম রেগে আছে, ব্রাউন বাঁ দিকের সমুদ্র দেখছে তো জেন ডানদিকের মানুষজন। ঐ ডাইনেই শ্রীমতী গর্ডন। সে মেয়েও কিছু ভারিক্কি বয়সের নয়। তার এক বাচ্চা, বাচ্চা নিয়ে মোমবাসায় স্বামীর কাছে যাচ্ছে। বিষম মুশকিল—নিজে লাইফবেল্ট পরেছে, বাচ্চা নিয়ে কি করে এখন! ওরই মধ্যে নিয়ে নেবে, কিন্তু ঢোকেও না তো! ঐটুকু খোলে দুটো প্রাণীর কেমন করে জায়গা হয়! শ্রীমতী তার উপরে কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাসছে সে মৃদু-মৃদু—লাজুক অপ্রতিভ ধরনের হাসি। জাহাজের সবচেয়ে স্ফূর্তিবাজ মেয়েটা, দেখুন দেখুন, মা হয়েছে কেমন! নতুন মায়ের আনাড়িপনা। আর, সত্যি সত্যি ঝড়ের মুখে পড়ে যদি জাহাজ—এবং ভেঁপু বেজে ওঠে সাতবার……ভয়াল সমুদ্র আক্রোশে আছড়ে পড়ে ডেকের উপর, যন্ত্রের গর্জন স্তিমিত হয়ে আসে, মাঝ-সমুদ্রের নিঃসহায় তরণী মাথা-ভাঙাভাঙি করে এদিক-

ওদিক, ঝড়ের মুখে এইটুকু মা দামাল বাচ্চা কেমন করে সামলাবে?

তেতলায় স্মোকিং-রুম। সন্ধ্যার পরে আজ আলোর বড় বাহার। নাচ হবে। জেন মহাব্যস্ত। কেবিনের দরজা হাঁ-হাঁ করছে, পরদার প্রান্ত হুকে আটকে উঁচু হয়ে আছে—দৃকপাত নেই। ভারি ব্যস্ত সাজগোজ নিয়ে। সারাদিন ধরে ঐ তার সব চেয়ে বড় কাজ, আর এখন তো মোক্ষম অবস্থা। আয়নার সামনে নানা ভঙ্গিতে দাঁড়াচ্ছে—এই তো আর এক নৃত্য। ঘষামাজা করছে কমনীয় কোমল অঙ্গ—বিশেষ করে পোশাকের বাইরে যতটা অনাবৃত থাকবে। কাত হচ্ছে কখনো—এপাশ-ওপাশ হয়ে দেখছে নিজেকে আয়নায়। দেখবার মতোই চেহারা একখানা রচনা করল বটে এতক্ষণ ধরে।

জাজ বাজনা বেজে উঠল। উপর-নিচে নানা কেবিন থেকে ছুটছে স্মোকিং-রুমে। নানা নদীখাল ছুটেছে উল্লাসের বিপুল সমুদ্রে। বিদ্যুতের আলো আরও জোরালো হয়ে উঠল। ঝাড়ের পরকলায় রঙ-বেরঙের আলো ছিটকে পড়ে; নাচের আসরেও ঠিক অমনি নানান রঙের লহর।

শুতে গিয়ে ভয়-ভয় করছে। এই কেবিনের মধ্যে বিষ খেয়ে মরেছিল নাকি এক জোড়া। গল্পটা শোনাল—আবার কে?—জাহাজের ত্রিকালদর্শী ভূষণ্ডীকাক মিঞা ভোলানাথ। দু'টিতে বাইরে আসত না বড়-একটা। ফুসফুস-গুজগুজ অনবরত। খানাঘরে বেছে নিয়েছিল কোণের একটা টেবিল। মেনু পাওয়া মাত্র গোটা চার-পাঁচ কোর্সের চটপট নাম বলে দিত। প্লেটে পড়তে না পড়তে গোগ্রাসে সমস্ত গিলত। যেমন মেয়েটা, তেমনি ছেলেটা। খাওয়া

নয় তো, গর্ত বোজানো। কোন গতিকে দায় সেরে আবার কেবিনের গহ্বরে ঢোকা। ঢুকে পড়ে—কাজটা কি ?—এ ওর দিকে চেয়ে থাকবে কেবল। ভোলানাথ বলল, মাঝে-সাঝে হুজুর যখনই ঢুকেছি, দু-খাটে দু-জন মুখোমুখি তাকিয়ে আছে। কথাবার্তা নেই, একেবারে চুপচাপ। দেশবিদেশে কত ঘুরেছি, কত রকমের মানুষ দেখেছি—কিন্তু এ জোড়ার মতন কেউ নয়। শুয়ে শুয়ে আশ মেটে না, দিনরাত্রি এত শুয়ে থাকতে পারে মানুষ! তারপর একেবারেই ঘুমিয়ে পড়ল একদিন। এবং যা নিয়ম, জোড়া ধরে ফেলে দিল দরিয়ার জলে। কোথায় বাড়ি, কি মতলবে এসেছিল, কি দুঃখে মরে গেল—কোন খবর জানিনে। কর্তারা জানতে পারেন, আমাদের কে বলতে যাচ্ছে ?

সেই কেবিনে আছি, তাদেরই একখানা খাটে। সব আলো নেবাইনি একেবারে। শিয়রের সবুজ আলোটা জ্বলছে। অনেক রাত্রে শুনি, দরজায় ঠকঠক করছে।

কে ?

জবাব নেই। জাহাজে বিছানা দেয় বড্ড বেশি নরম। শুয়ে সুখ নেই, বিছানায় গিলে খায় যেন। অথবা জাহাজেরই মতন কেবিনের খোলে এই ভেসে রয়েছি। শোওয়া নয়, চিৎসাঁতার। মৃদু হাতে ওদিকে দুয়োর নাড়ছে কেবলই। যে আঙুলের ছোঁওয়া, মনে হল, চাঁপার কলির মতন। বললাম, কে তুমি ? ভিতরে চলে এসো।

জবাব দেয় না, থামবেও না। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। মানুষ কোথা ? বাতাস। ঘুমন্ত সমুদ্রের উপর বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে, টোকা দিচ্ছে এসে আমার দরজায়। ডাকছে, এসো গো—বাইরে এসো।

ইঞ্জিনের ফিসফিসানি, আর জলের ক্ষীণ কল্লোল। পিছন দিকে অনেক দূরে একটা আলো দেখা যায়। আলো একবার এই

নিচু হয়ে সমুদ্রে ডুব দিল, তখনই আবার আকাশের দিকে ছুটল হাউই হয়ে। একটা তো নয়, আলো ছুটো। ছুই আলো পালা করে উঠানামা করছে। কারা তোমরা রাত্রিবেলা অকূলযাত্রীদের আলো দেখাচ্ছ ?

এক ছবি মনে আসে। ঘরে চাল বাড়ন্ত। আট আনা পয়সার জোগাড় হয়েছে, কিন্তু চাল আনবার মানুষ জোটে না। শীতলাতলায় দীননাথের বাড়ি। ব্যাপারি মানুষ, সেখানে ঠিক চাল মিলবে। আট আনায় সের ছয়েক তো বটেই। কিন্তু ছোট্ট মানুষ যে আমি —একলা যেতে ভয় করে। মা এগিয়ে এসে আলো ধরলেন বাঁশতলার মোড়ে। জেঠাইমা পাশে। ঘুরঘুট্টি-আঁধার বাঁশবনে আলো ঝিলমিলিয়ে উঠল। আজকে কোথায় তাঁরা ? ঐ তারালোকের রাজ্যে ? বাহির-সমুদ্রে পড়বার মুখে দীপ ধরে দাঁড়িয়েছেন—সে-কালের ছুই সখী। মা আর জেঠাইমা। রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে আছি। হাওয়ায় পর্দা নড়ছে খড়খড় করে। গা ছমছম করে—আবছা আঁধারে অনেক মানুষের আনাগোনা। আমার চারিদিকে অগুন্তি মানুষ। সমুদ্রে যত মৃতদেহ ফেলে দিয়েছিল, উঠে উঠে জড় হচ্ছে। সিঁড়ি নামিয়ে দিয়েছে—দড়ির সিঁড়ি, পাইলট উঠে আসবে বলে বন্দরের মুখে যে সিঁড়ি নামিয়ে দেয়। চোখে দেখা যাচ্ছে না সিঁড়ি, কিন্তু অনুভূতির বাইরে নয়। ভরে গেছে সমস্ত ডেক। ডেকচেয়ারগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে—অন্ধকারে আয়েশ করে বসবে। তাদের পুরানো জায়গা। তাদের কামরায় নতুনেরা জমিয়ে বসেছে, তাদের আজকে চেনে না কেউ। একদিন ওদেরই ছিল এই জাহাজ, পুরনো লগ-বুকে নাম পড়ে দেখুনগে। এই আমাদেরই মতো। গ্রামের বাড়ি গিয়ে দেখেছি, হাল আমলের ছেলেরা অবাক চোখে তাকায়। কোথা হতে এলো লোকটা, কি

চাইছে? হায় রে, আমার আপন জায়গা থেকে একেবারে বেদখল্ করে দিয়েছে। ঠিক সেই ব্যাপার।

অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ঐ প্রেতলোকের ভিড়ের ভিতর। হাসছেন আপনারা, ঘরে বসে অনেকেই অমন হেসে থাকেন। কিন্তু নিঃসীম জলের উপর রাত দুপুরে এখন আর এক জগৎ। কিবা পণ্ডিত কিবা মূর্খ, কিবা ধলা কিবা কালা, এখানে এসে বাছবিচার নেই। এই ধরুন, পানসিতে পা ছড়িয়ে বসে সুন্দরবনের মাঝিমাল্লার মুখে যা সমস্ত শুনেছি, এখানে জাহাজের আগুনমুখো স্কচ সাহেবের কাছেও প্রায় তাই। সমস্ত নাকি চোখে-দেখা জিনিস—বিজ্ঞানের হিসাবপত্র অত গভীর অবধি পৌঁছয় না।

অনেক রাত্রে শান্ত সমুদ্রে ঝড়বাতাস তিলেক মাত্র নেই, হঠাৎ দেখবেন, জাহাজের একদিকে তরঙ্গ উথলে উঠল। জল উঁচু হয়ে উঠছে—উঁচু—আরও উঁচু, সর্বনাশ, ডেকের উপর গড়িয়ে পড়বে নাকি? ডুবিয়ে ভাসিয়ে একাকার করে দেবে?

দুষ্টামি ওটা, সাগরকন্যাদের কৌতুক। কৌতুকী মেয়ের দল উঁচু হয়ে উঠে জলের উপরের নগরটায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পোর্টহোলের ফুটো দিয়ে দেখছে মানুষগুলোর কাণ্ডকারখানা। চিড়িয়াখানার খাঁচার গরাদে দিয়ে জানোয়ার দেখা আর কি! জলের অবগুণ্ঠন লজ্জাবতীদের মাথার উপরে, সমুদ্র-জল ফেঁপে ফুলে উঠেছে তাই দেখতে পাচ্ছেন না। লীলাখেলা অবসানের পর খিলখিল করে ছলছল করে হাসতে হাসতে তারা পাতালের ঘরবাড়িতে চলে যাবে। উত্তাল সাগর দীঘির মতন হবে আবার।

রাত্রে যেদিন ঝড় উঠবে, কান পেতে থাকবেন তো খানিক। আশ্চর্য এক গান শুনবেন। দুড়ুম-দাড়াম করে জল আছড়াচ্ছে জাহাজের গায়ে, প্রপেলার পাগল হয়ে মাথা কুটছে। সেই গর্জমান তরঙ্গ, আশঙ্কিত জাহাজ, হাজার হাজার ক্রোশ থেকে ছুটে-আসা

নির্বাধগতি মহাঝড়—তারই মধ্যে মিলিত কণ্ঠের সুরঝঙ্কার, মধুর এক মৃত্যুসঙ্গীত। কোথায় উৎসব পড়ে গেছে, গান গেয়ে আবাহন করছে ডুবন্ত জাহাজের অতিথিদের। ঢেউয়ের উপর আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে যখন তলিয়ে যাচ্ছেন, শত শত কোমল বাহু উদ্যত হয়ে আছে—সমাদরে বুকে নেবার জন্য। এখানে এত অন্ধকার, ঐ রাজ্যে প্রভাতের আলো। এখানে মৃত্যু, ওখানে নবীন জন্মলগ্ন।

হঠাৎ দেখি, চাঁদ উঠে গেল। ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, আকাশে উঠে এখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নিঃসীম জল, আকাশের চাঁদ, আর এই জাহাজ। আর দূরের সেই যুগল আলো উঠানামা করছে সমুদ্রের মধ্যে। ভারি আশ্চর্য!

অগুন্তি ডেকচেয়ার পাশাপাশি। সন্ধ্যায় সমস্ত ভর্তি ছিল, ঘুরে ঘুরে একটু বসবার জায়গা পাইনে। এখন খালি। হাওয়ায় ফরফর করে চেয়ারের কাপড় উলটেপালটে দিচ্ছে। ছাতে-লাগানো বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে শূন্য চেয়ারগুলোর উপর। যেমন ভেঙে-যাওয়া রাজ-দরবারে ঝাড়লণ্ঠন ম্লান আলো ছড়ায়।

শ্রীমতী গর্ডন আসছে স্মোকিং-রুমের দিক থেকে। আলোর নিচে দিয়ে আসছে, তখন স্পষ্ট দেখলাম। মুখের রং টকটকে লাল, পা টলছে। বাচ্চা ঘুমিয়ে গেছে, মা আর নেই—বার থেকে ফিরছে শ্রীমতী। নিচের ডেকে আবছা জ্যোৎস্নায় একটি-দুটি খালাসির আনাগোনা। নিঃশব্দ গতি। ভুল ভাঙল—জাহাজ যত নিষুপ্ত ভেবেছি—তা নয়, জেগে আছে কেউ কেউ। আরে কে তুমি—শেখ ভোলানাথ যে!

দূরের আলোর দিকে আঙুল তুলে ভোলা মিঞা বলল, লাইট-হাউস ওখানে—ডুবো-পাহাড় আছে, তারই নিশানা। জাহাজ ঢেউয়ে উঠানামা করছে—মনে হচ্ছে, দুই আলো নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

ভোলানাথ, ঘুমোও নি ?

ডিউটিতে ছিলাম, ছাড় পেয়ে এখন যাচ্ছি। সকাল না হতেই ধোয়ামোছায় লাগতে হবে আবার। সালাম!

মাতা বসুমতী মাঝ-সমুদ্রে একটুকু মাথা তুলে আলো দেখাচ্ছেন ভাসমান সন্তানদের। পথ না হারায়, অপথে-কুপথে ঘুরে মারা না পড়ে। নজর পড়ল কোণের দিকটায়। সাহেব-মেম পাশাপাশি মত্ত হয়ে সমুদ্র দেখছে। কাছে—আরও কাছে—দুই মাথা এক হল যে একেবারে, এর বাহু ওর কাঁধে এলিয়ে আছে। বুঝতে পারিনি, অজান্তে এসে পড়েছি একেবারে সামনে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! জেন আর ব্রাউন। যাকগে, টের পায় নি। তাকাল না মুখ তুলে। তাকানোর অবস্থাই নেই, চোখ-কান এখন অকর্মণ্য হয়ে গেছে।

স্লিপার আমার পায়ে। তলায় রবার দেওয়া, শব্দ হয় না। টিপিটিপি ফিরে এলাম। খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম আবার। চাদরটা টেনে দিলাম গায়ে। সোয়াস্তি পাইনে, দরজা খটখট করছে। দরজাটাই ঐরকম—কবজা ঢিলে হয়ে গেছে। অথচ মনে হবে, দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে কে ভিতরে আসবার জন্য।

(৭)

লঙ্কা—স্বর্ণলঙ্কা ঐ যে সামনে! কাল সন্ধ্যায় দেখেছিলাম মেঘছায়া-তলে লঙ্কার বিষণ্ণ পাহাড়শ্রেণী। তারপর কালো অন্ধকারে দিগ্বিদিক একাকার হয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলে কেবিনে ঢুকে পড়লাম।

রাতে ঘুম হয় নি—বেরিয়ে কতবার ডেকের উপর দাঁড়িয়েছি। তিমিরমগ্ন লঙ্কাপুরী বেষ্টন করে চলেছি—ভূলুণ্ঠিতা পুরীলক্ষ্মী

গুমরে গুমরে কাঁদছিল যেন। হাজার হাজার বছর ধরে এই কান্না।

আর্যভূমির সেই এক রামরাজা শুধু নয়—পরবর্তী চোল-সম্রাটরা এবং য়ুরোপের বণিকগোষ্ঠী বারংবার এসে লঙ্কার কাঁধে পা চাপিয়েছে। যারা আসে নি, সেই ক'টি জাতেরই হিসাব নেওয়া বরঞ্চ সোজা। মানুষের নামগুলো অবধি য়ুরোপীয়। পৈতৃক নাম যাঁর ডি-সুজা স্বাধীন হবার পরে রাতারাতি তিনি অবশ্য গুণবর্ধন কিম্বা সেনানায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

ভোরবেলা আকাশ আজ বড় প্রসন্ন। জাহাজ পশ্চিম কূল ঘেঁষে চলেছে। এ ক'দিন সূর্য উঠেছে আমাদের বামদিকে, আজ ডাইনের আকাশে রঙের বাহার। সোনা মেখে গেছে আকাশ ও পাহাড়ের চূড়ায়; সাদা মেঘের কিনারাগুলো সোনায় বাঁধানো। মেঘডম্বুর শাড়ির সোনালি পাড় যেন। ধূম্রবর্ণ বিশাল এক মেঘস্তূপ পাহাড়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। কষ্টিতে খাঁটি সোনা ঘষলে যেমনটা হয়—মেঘের উপর কে সহসা কয়েকটা সোনার আঁচড় কেটে দিল।

ফরসা হয়ে গেছে, লাইট-হাউসে বিদ্যুতের আলো জ্বলে জ্বলে উঠছে তবু। সারারাত্রি এমনি আলো দেখিয়েছে—তটভূমির ডোবা-পাহাড়ে জাহাজ লেগে দূরাগত অতিথিদের বিপদ না ঘটে। ক'দিন আগে ও-পারের তীরভূমি আলো দেখিয়ে অকূল সমুদ্রে বিদায় দিয়েছিল, কাল রাত্রে কূলে কূলে সাবধানে আলো ধরে লঙ্কা আমাদের এগিয়ে নিয়ে এলো।

আগুন!

ছেলেবেলা মার মুখে রামায়ণ শুনতাম। পরাজিত বিয়োগ-বিধুর নগরীর প্রান্তে সমুদ্রকূলে রাবণের অক্ষয় চিতা। সে আগুন আজও জ্বলছে। কানে হাত-চাপা দিন—আগুনের আওয়াজ পাবেন। সে আগুন আকাশব্যাপ্ত হয়েছে ঐ দেখুন, এক-ইঞ্চি

জায়গা বাকি নেই। সহসা আশ্চর্য কাণ্ড—সমুদ্রতল থেকে লাফিয়ে সূর্য ঝাঁপ দিয়ে পড়ল অগ্নিময় আকাশে। মেঘ এল কোথা থেকে —স্নিগ্ধ কালো আস্তরণে পরম যত্নে সূর্যকে ঢেকে দিল। আগুন স্তিমিত হয়ে এল ক্রমে—মেঘের ঢাকা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে উজ্জ্বল হাসি হেসে উঠল সূর্য। ভায়োলেট রং সর্বত্র—জলে রং গুলে গিয়ে সমুদ্র এখন ভায়োলেট হয়ে গেছে।

অসংখ্য কৃষ্ণবিন্দু। বাইনোকুলারে দেখছিলাম—কাছাকাছি এসে এবারে সুস্পষ্ট হল। খান তিনেক কাঠ একত্র জুড়ে তারই উপর পাল খাটিয়ে দুঃসাহসী মানুষেরা দূর-সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে। জাহাজের গোনাগুণতি মানুষ দেখে আসছি, ক-দিন পরে নতুন মানুষ দেখলাম। মানুষের দল।

কলম্বো আর দূরবর্তী নয়। কুয়াশায় সহসা ঝাপসা হল চারিদিক। শৈশবে শোনা রূপকথার মতো, অনুপম স্বপ্নস্মৃতির মতো, মৃত্যুর মতো···

সিঁড়ি নামাচ্ছে। পাইলট-তরী আসছে তরতর করে। পুলিশ ডাক্তার আর কাস্টমসের লঞ্চ এসে জাহাজের গায়ে ভিড়ল। হিসাব মেটানো হচ্ছে পার্সারের সঙ্গে—সকলে কৌতুক ও ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে। পার্সার নিজেও। একশ', দেড়শ', দু-শ'—এই রকম সকলের বিল—আমাদের এই দু'টি পুরুষের সাকুল্যে হয়েছে সাত টাকা সাড়ে দশ আনা। বরুণ রাজার এলাকায় ডিউটির জবরদস্তি নেই—মদ-সিগারেট তাই ডাঙা-রাজ্যের অর্ধেক দামে বিকোয়। এ হেন সুবর্ণসুযোগ সত্ত্বেও একটি সিগারেট পোড়ায়নি, বারে বসে এক ঢোক গলা ভিজিয়ে নেয় নি—এমন আহাম্মক চাঁদের নিচে কে দেখেছে বলুন?

ভারতের মানুষ, প্রতিবেশী আমরা—পুলিশ খাতির করে নিজেদের লঞ্চে ডাঙায় পৌঁছে দিল। মুনি সিংহের ছেলে মোটরের দরজা খুলে অপেক্ষমান—

আসুন, এই যে!

লঙ্কায় সোনা সস্তা—এই সবাই শুনে আসছেন। মণিমুক্তারই জলের দাম—সামান্য সোনার বাজার কে ঢুঁড়তে যায়? তারা-ভরা রাতে মান্নারের জলে, শুনেছি, ঝিনুকেরা দলে দলে সাঁতরে বেড়ায়—স্বাতী নক্ষত্র থেকে এক ফোঁটা শিশির কখন পড়বে। সুধাস্বাদে উদর ভরে নিয়ে তারপরে এক সময় সমুদ্রে ডুব দেয়। তারার দ্যুতিও ঝরে পড়ে কিনা শিশিরের সঙ্গে—জমাট হয়ে গিয়ে তাই থেকে মুক্তার জন্ম। সমুদ্রের অতল নিষুপ্তি থেকে উদ্ধার করে সেই মুক্তায় মানুষ সুন্দরীদের অর্চনা করে।

রত্নপুরের কথা পড়েছেন পুরাণাদিতে। পুরানো কাল থেকে খুঁড়ে খুঁড়েও মানুষের অধ্যবসায় রত্নভাণ্ডার শেষ করতে পারে নি। মাটির পরতে পরতে মণিরত্ন। চাষ-আবাদের কাজ যেই চুকল, কেউ বসে নেই—ঠুকঠুক করে, দেখতে পাবেন, মাটি খুঁড়ছে। খুঁড়ছে মাটি, আর জলে ধুচ্ছে—ধুয়ে ধুয়ে কাঁকর জমাচ্ছে। কাঁকরগুলো পরখ করছে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সাত দিনে হয়তো এক ঝুড়ি কাঁকরই জমল শুধু, আবার একদিনে হঠাৎ সাত রাজার ধন মাণিক মিলে যায়। কাদা-মাখা অবহেলিত একটা ঢেলা কাটাই হয়ে দেখতে দেখতে অপরূপ দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

কলম্বো ও কাণ্ডিতে শ' দুই-তিন শৌখিন দোকান—দেশ-বিদেশের সীমন্তিনীরা ঘুরে ঘুরে মণিমাণিক্য পছন্দ করেন, এবং মনিব্যাগ খালি করেন পিছনে ছায়াবৎ সঞ্চরমান হতভাগ্য হুকুমবরদারদের।

কত দাম এটার ?

রিয়্যাল এমারেল্ড ম্যাডাম। আড়াই ক্যারেট আছে ওজনে। পঁচিশ টাকা লাগবে।

ঝানু ললনাও আছেন। তাঁরাই বরঞ্চ বেশি।

দেড় টাকায় দেবে ?

আমাদের এক দাম।

দেবে তো বলো। নইলে পথ দেখলাম।

আচ্ছা, নিয়ে নিন। আর কি চাই ?

দেড় টাকায় রিয়্যাল এমারেল্ড কিনে হরষিত মনে যাচাই করতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে, দাম তার দেড় পয়সাও নয়। রঙিন কাচ এক টুকরো। জহরতে জোচ্চুরি ঢুকেছে। সাধ্বী সাবধান!

মহানবমীর দিন এদেশে এত আমোদ-ফূর্তি, আমরা ঢাকের বাজনাটাও শুনলাম না। নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে ছুটছি। বনে না হয়ে শহরে থাকলেও অবস্থার ইতরবিশেষ হত না। রামচন্দ্র এই লঙ্কাভূমিতে অকালবোধন করে লড়াই জেতেন। দুর্গাপূজোর উপর সেই হেতু কি এরা বিমুখ ? জানেও না কেউ, আজ একটা বিশেষ দিন বাংলা পঞ্জিকায়।

নিবিড় বন—বন ফুঁড়ে পিচের টানা রাস্তা। একটা আলপিন পড়ে থাকলেও নজরে আসবে, এমন পরিচ্ছন্ন। ঝরা পাতাগুলো পর্যন্ত এমন ঝাটপাট দিয়ে সরিয়ে যায় কে বলুন দিকি ? মোটরের মাইল-মিটারে অঙ্ক খরবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা-দুটো ছোটখাট লোকালয়—বুনো হাতীর ভয়ে প্রতিটি বাড়ি শক্ত বেড়ায় ঘেরা। বন হাসিল হচ্ছে কোথাও—আগুন দিয়েছে। আগুনে হাতী এগোয় না। বড় গাছের উঁচু চূড়ায়—অনেক উঁচুতে ছোট্ট ছোট্ট ঘর—মানুষ-পাখীর বাসা। যারা বন কাটতে এসেছে, রাতে

তারা ওখানে থাকে। উঠা-নামার মই আছে। তা আছে ওরা মন্দ নয়—দেদার হাওয়া খায়, ভুবনের যাবতীয় রাজা-মহারাজার মাথার অনেক উপরে বসে পা দোলায়। দূরে ঘন-নীল পাহাড়ের সারি; এক একটা পাথরের চাঁই এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। আর বন চলেছে একটানা। গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে—বন পার হয়ে বেলাবেলি সিগিরিয়ায় পৌঁছুতে পারে যদি। সিগিরিয়া—সিংহগিরি!

সে আর হয়ে উঠল না। সন্ধ্যা হয়েছে। চাঁদও উঠেছে হয়তো—কিন্তু গাছপালার আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে, মাঝ-আকাশে উঠলে তবে দেখা পাব। রেস্ট-হাউসের সামনে থেমে পড়ে গাড়ি হাঁপাতে লাগল। গার্ড ছুটে আসে—উঁহু, ওখানে কেন? হাতীর এলাকা এটাও হাতী অনেক রকমের—ভদ্র আছে যেমন, তেমনি আছে অতিশয় ত্যাঁদোড়। কিচ্ছু বলা যায় না। গাড়ি ভিতরে একেবারে বারাণ্ডার গায়ে এনে রাখো—

সারাদিন কষ্ট গিয়েছে, অনেক ঘুরেছি। ইঁদারার জলে প্রাণভরে স্নান করে পরিশুদ্ধ হলাম। চেয়ারটা টেনে নিয়ে এলাম উঠানে। আসে আসুক বুনো হাতীরা—তার জন্য জীবনের এই পরমাশ্চর্য রাতটা ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দেব? ক্লান্ত দেহ ছড়িয়ে দিলাম ইজিচেয়ারের উপর।

বিশ্রুতকীর্তি মহারাজ ধাতুসেনা—অনুরাধাপুর ও সমগ্র লঙ্কা তিনি কলঙ্কমুক্ত করেছেন। তামিল-শত্রুরা বিতাড়িত। কিন্তু রাজা আত্মকলঙ্ক সুগোপনে লালন করেন অন্ত্যজ-পল্লীর এক পর্ণকুটিরে। সেখানে থাকেন কশ্যপ ও তাঁর মা। আর নগরী-কেন্দ্রে সপ্ততল স্ববর্ণপ্রাসাদে থাকেন মহারাণী, রাজকন্যা ও কুমার

মোগ্গল্লান। কশ্যপের মা একদা ঐ প্রাসাদের দাসী ছিলেন—রাজার প্রণয়ভাগিনী হয়ে তারপরে এই সর্বনাশ !

তামিল-বিজয়ের পর সেনাপতিকে রাজা পুরস্কার দিতে যাচ্ছেন :

অতুল তোমার ভুজবল, সেনাপতি। কি প্রার্থনা বলো। সমগ্র রত্নভাণ্ডারের কামনা করলেও আমি তা দিয়ে দেবো।

রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা করি, মহারাজ। লঙ্কার সর্বোত্তম রত্নও নিষ্প্রভ যাঁর রূপের দ্যুতিতে।

কীর্তিমান ধাতুসেনা—মুখের বাক্য আর মুখামৃত গিলে ফেলা তাঁর ধর্ম নয়। সপ্ততলবাসিনী রাজকন্যা এই প্রথম বোধহয় ভূমি স্পর্শ করে সেনাপতির গৃহে চললেন।

রাজকন্যার পরিচর্যার তিলেক ত্রুটি না ঘটে—রাজা নিজে দেখে-শুনে সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সংবাহকরা খাটপালঙ্ক এবং বিলাস-উপচার ফিরিয়ে নিয়ে এল। রাজকন্যাই শুধু রইলেন। আর বার্তা নিয়ে এল—জামাতার নয়, তাঁর মায়ের কাছ থেকে—তোমার মেয়ে আর এখন রাজকন্যা নয়, গৃহস্থবধূ। আমাদের ছোট ঘরে এত বাহুল্য-বস্তুর ঠাঁই হবে না। বেমানানও বটে।

মাস ছয়েক পরে ধাতুসেনা মেয়ে দেখতে গেছেন। মলিন-বসনা এ কোন ভিখারিণী এসে দাঁড়াল ! মৃণালের মতো ডান হাতখানি রাজা সস্নেহে তুলে ধরলেন—সর্বনাশ, এ কী সর্বনাশ—পোড়া-ঘায়ে বক্র বিকৃত সেই হাত।

রক্তচক্ষে রাজা গর্জন করে ওঠেন : রান্না করাও বুঝি আমার মেয়েকে দিয়ে ? দাসীবৃত্তি করাও ?

সেনাপতির মা বললেন, মহারাজ, রাজ্য আপনার বটে, কিন্তু এ সংসারের অধিকর্ত্রী আমি। কুটুম্বের বহির্বাটীতে স্থান—সেখানে চলে যান। অন্তঃপুরে অনধিকার চর্চা করবেন না।

কথা শেষ না হতেই আর্তনাদ উঠল। রাজার হুকুমে জ্বলন্ত চুল্লিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সেনাপতির মাকে। রাজকন্যা বাপের সঙ্গে আবার সপ্তমতলে গিয়ে উঠলেন।

অবমানিত প্রতিহিংসাপর রাজ-জামাতা খুঁজে খুঁজে নগরোপান্তে কশ্যপকে আবিষ্কার করলেন।

একই পিতার পুত্র তোমরা। একজনের ভোগে স্বর্ণ হর্ম্য, আর একের পঙ্কশয্যা—

আমি যে দাসীপুত্র!

রাজাকে হত্যা করতে হবে।

কশ্যপ শিউরে উঠলেন: পিতৃহত্যা ?

পিতা হোক, যা-ই হোক—তোমার মায়ের সম্মানহন্তা। রক্ত দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আমি সহায় রইলাম—সিংহাসন হবে তোমার। ধাতুসেনার নামযশ হল, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে তামিল-তাড়না করেছি তো আমিই।

পিতৃঘাতক কশ্যপ। সাধুসজ্জন তাঁর নামে কানে আঙুল দেয়।

সিগিরিয়ার পাদভূমে রেস্ট-হাউসের আরাম-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। সিগিরিয়া পাগল করেছে দেশ-দেশান্ত আর যুগ-যুগান্তের মানুষ—সে ঐ জঙ্গলের মধ্যে অনুচ্চ অনতিস্পষ্ট পাহাড়টুকু ?

কানে যেন শুনতে পাচ্ছি শতাব্দী-পারের খটাখট অশ্বখুর-ধ্বনি। অনুরাধাপুরের পুরানো রাস্তাই রেস্ট-হাউসের সামনে দিয়ে চলে গেছে—যে রাস্তায় একালের মোটরযান চেপে হর্ন বাজাতে বাজাতে খানিক আগে এসে পৌঁছলাম।…খবর এসেছে, মোগ্গল্লান বিপুল বাহিনী জোগাড় করেছেন ভারতবর্ষে পালিয়ে

গিয়ে। তামিলরাই এখন পরম বন্ধু তাঁর—তারা আবার আসছে, এসে পড়ল বলে। অনুরাধাপুরের মুক্ত অঞ্চল ত্যাগ করে দুর্গম গিরিকক্ষে কশ্যপ সদলে আশ্রয় নিলেন। জনপদ গড়ে উঠছে চারিদিকে। সমস্ত বাধা প্রতিহত করে শত্রু যদিই বা গিরিমূল অবধি পৌঁছয়, গিরিকন্দরে ঢোকা একেবারে অসম্ভব।

দেড় হাজার বছর আগেকার বিস্মৃত সেই জনপদে বিদেশি দুটি পথিক অনেক পথ অতিবাহন করে আজ সন্ধ্যায় আশ্রয় নিয়েছি। আমি আর উমাপ্রসাদ।

গভীর রাতে চাঁদ ডুবে গেল, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বিলুপ্ত হল চতুর্দিক। পরিত্যক্ত প্রাচীন নগরে দুটি প্রাণী বসে বসে প্রহর গণছি। ঝিমঝিম করছে রাত। একটা আলোড়ন জাগল সহসা ঝোপঝাড়ের মধ্যে। বুনো হাতী নিশ্চয় নয়—তারা দল বেঁধে বেড়ায়। কশ্যপ পরাজিত হবার পর জঙ্গল এঁটে গেছে অনেক শতাব্দী ধরে। সিগিরিয়াকে লোকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। জঙ্গল এখনো নিবিড়—নানান জানোয়ার নিঃশঙ্কে চরে ফিরে বেড়ায়। শুধু রসিক দু-পাঁচজন আসে তীর্থযাত্রীর মতো। আর প্রত্ন-বিভাগের কয়েকটি লোক সিগিরিয়ার বর্ণাঢ্য সম্পদ আগলে রয়েছেন অতন্দ্র প্রহরী হয়ে।

সিগিরিয়া—সিংহগিরি। আকাশব্যাপ্ত সিংহ থাবা মেলে বসে আছে—সিংহ এখন থাবা মাত্রে এসে ঠেকেছে। নখরযুক্ত ঐ পা—আর সমস্তই ভাঙাচোরা, নতুন গাঁথনির তালি দেওয়া। ঐ থেকে সুবিশাল মহাজন্তুর পূর্ণমূর্তি আন্দাজের চেষ্টা করি। নগণ্য নরকীট আমরা—ঐ থাবার ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে গতায়াতের ব্যবস্থা। তা-ও তো অনেক বড়—তিন-চার জনে পাশাপাশি ঢুকতে পারে, মাথায় মাথায় দুটো মানুষ দাঁড়ালেও ফাঁক থেকে যায়।

একটু চত্বর আছে সিংহের সামনে। ইতস্তত দু-চারটে গাছ ও

লতার ঝোপ। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছে একটা মেয়ে। ছবি তুলবে কি—হেসেই খুন। কিসের এত হাসি রে বাপু? এক ছোকরা এসে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে। কাড়াকাড়ি লেগে গেল—বিষম লড়াই। আমরা তাকিয়ে পড়তে মেয়েটা চুপ হয়ে গেল। পিছন ফিরল ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে। মাথার ঝাঁকুনিতে দু'পাশের দুই বেণী সর্পিণীর মতো ফণা তুলিয়ে উঠল আমাদের দিকে।

পথ অতি দুর্গম। অল্প একটুখানি সিঁড়ির মতো—তারপর দস্তুরমতো কসরৎ করে উপরে উঠতে হয়। পাহাড়ের গায়ে পা রাখবার একটু একটু খাঁজ। পা দিয়ে নয়—রেলিঙে ঝুল খেয়ে হাতের বলে এগোচ্ছি। আকাশে মেঘের ভার। আর এমনি এই লঙ্কার আকাশ—যখন তখন কেঁদে ভাসায়। জল হলে পাহাড়ের উপরে পিছল হয়ে যাবে—তখন যে কি হবে, ভাবতে পারিনে। এগুনো যাবে না, আবার নামবই বা কেমন করে?

খানিক উঠে পিছনে তাকাই। নিকটে দূরে ছোটবড় অগণ্য পাহাড়, আর বনে ঢাকা শ্যামলভূমি। চত্বরের ওদিকে হাসির তরঙ্গ উঠল—সেই দুটি পাশাপাশি বসে গল্প জুড়েছে এবার। এ কী চপল লীলা হাজার হাজার বছরের প্রবীণ গিরিবিটপীর অন্তরালে! সেকালেও কি পুরবালাদের এমনি খেলা জমে উঠত বহু নিম্নের নগর-চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে?

আরও উপরে—অনেক উপরে—অবশেষে চূড়ায় পৌঁছানো গেল। রাজা কশ্যপ এইখানে বসতেন মসৃণ বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর। সমস্ত সিংহগিরিটাই যেন সিংহাসন—তার সর্বোচ্চ শিখরে বসে মহারাজ সাগরচুম্বিত সাম্রাজ্য নিরীক্ষণ করতেন। অনুরাধাপুর মিহিনতাল অবধি এখান থেকে নজর চলে।

ঝড় বয়ে যাচ্ছে শিখরে, দাঁড়াতে দেয় না। অনধিকারী

আমরা জবরদস্তি করে উঠে পড়েছি—অলক্ষ্য রাজ-অনুচরেরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে নাকি ?

সিগিরিয়ার আসল ঐশ্বর্য কিন্তু আশ্চর্য এক চিত্রশালা। তিমিরতন্দ্রিত গুহাকক্ষে দীর্ঘকাল গোপন ছিল—লোকে সেখানে যেতে পারত না, যাবার পথ ভেঙে পড়েছিল। যখন জানাজানি হল, দর্শকেরা নিচে থেকে মুগ্ধ চোখে সামান্য কিছু দেখে অতৃপ্ত মনে বিদায় নিত। এখন ঘোরানো সিঁড়ি এবং কাঠের প্ল্যাটফরম হয়েছে। রাজ-অন্তঃপুরিকাদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সকল বাধা দূর হয়েছে এই নতুন কালে।

অজন্তার মতোই উজ্জ্বল দেয়াল-চিত্র। নিতান্তই ঐহিক—কোন উঁচু আধ্যাত্মিক প্রেরণা নেই চিত্রকর্মের মূলে। রাজবধূ-রাজকন্যা এঁরা—পরিচারিকাও আছেন কয়েকটি।

কেউ কেউ বলেন, অপ্সরা। আর প্রত্নাধ্যক্ষ পর্ণবিতানের মতে, এঁরা মেঘলতা ও বিজুরিলতা। নভোব্যাপ্ত মেঘের মধ্যে আধেকখানি শরীর মাত্র জেগে রয়েছে।

দেড় হাজার বছর ছবির বয়স—কে বিশ্বাস করবে? রঙের ঝিকিমিকিতে মনে হচ্ছে, শিল্পী সবে তুলি রেখে প্লাটফরমের পাশে অফিসঘরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন—আবার কাজে লাগবেন এসে এখনই। কিংবা ছবিই নয় হয়তো। রূপসীরা বনগুণ্ঠনে আত্ম-গোপন করেছিলেন—নতুন কালের উপদ্রবে লজ্জায় শিলার সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন, রূপগুলির রঙিন ছায়া পড়ে আছে কঠিন দেয়ালে। মানুষের আঁকা ছবি—কিছুতে বিশ্বাস হতে চায় না।

আমরাই শুধু নই—চিরকালের মানুষ এদের জীবন্ত ভেবে এসেছে। পাথরের গায়ে অসংখ্য তার পরিচয়। গাইড দেখাতে লাগল, পড়লও কিছু কিছু। কাগজের উপর আমার এই কালির ক্ষণজীবী আঁচড় কাটা নয়—ছবির আশে-পাশে পাহাড় কেটে

কালের গায়ে লিখে গেছে তারা বলিষ্ঠ বন্দনা-গান : হে রূপসী, আমি বিমুগ্ধ পতঙ্গ। আত্মাহুতি দেবো—হে প্রোজ্জ্বল অগ্নি, তুমি আমায় গ্রহণ কর। অচঞ্চল কেন কুসুমবতী—শাণিত কটাক্ষঘাতে আমায় হত্যা কর···

পঞ্চম, অষ্টম, দ্বাদশ, সপ্তদশ—বিভিন্ন শতাব্দীর এমনি কত লেখা। কালে কালে অক্ষরের ছাঁদ ও কবিতার ছন্দ বদলে গেছে—কিন্তু বলার কথা একটিই। সুন্দরের কাছে মুগ্ধ মানুষের আত্ম-নিবেদন। যুগের পর যুগ পাগল হয়ে যারা ভালবেসেছে, তাদের সকলের অফুরন্ত এক মিছিল যেন। সেই প্রেমিকদলে সকলের পিছনে আমরা এই দু-জন বঙ্গবাসী।

পর্ণবিতানকে ভাবতে গেলে আমার কেমন দীনেশ সেন মশায়ের কথা মনে পড়ে যায়। চেহারা ও প্রকৃতিতে দু-জনের ভারি মিল। কাজের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—যুক্তির চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে হৃদয়াবেগ। কলম্বোয় জরুরি সভা, গাড়ি তৈরি, অনুরাধাপুর থেকে তখনই রওনা হবেন—আমাদের দুই বিদেশিকে পেয়ে সকল দায়িত্ব ভুলে বুড়োমানুষ চললেন মিহিনতালের পাহাড়ে জঙ্গলে। পায়ের মোজা দুটো হয়তো দু-রঙের—সেদিকে হুঁশ নেই, কিন্তু অতীত-লঙ্কার সমস্ত অলিগলি তাঁর নখদর্পণে।

ভয়ার্ত কশ্যপের আশ্রয়দুর্গ এই সিগিরিয়া—পর্ণবিতান কিছুতেই মানবেন না। প্রাণে যাঁর অনুক্ষণ ভয়-ভাবনা, তিনি এমন শিল্পসুন্দর আবাস রচনা করতে পারেন? এত বাহুল্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ অসম্ভব সেই মানুষের পক্ষে প্রাণের আতঙ্কে যিনি সোয়াস্তি পাচ্ছেন না।

সর্বমান্য রাজাধিরাজ হয়েও অন্ত্যজ দাসীপুত্রের তৃপ্তি হল না। রাজত্ব নয়—তারও বড়, দেবত্ব কামনা করেন তিনি। প্রজাসাধারণ ভয় না করে ভক্তি করবে। ঐশ্বর্য জুটেছে—ঐশ্বর্যের দেবতা কুবের

হতে চান এবার। আর এই সিগিরিয়া তাঁর অলকাপুরী। কাব্যে যে অলকাপুরী আছে, তার সমস্ত বর্ণনা ও সকল লক্ষণ মিলিয়ে নগরীর পরিকল্পনা। কঠিন পাথরের উপর বাটালির ঘায়ে ঘায়ে মেঘলোকের অলকাপুরী মূর্তি পেয়েছে।

মোগ্গল্লান এসে পড়লেন সেনাবাহিনী নিয়ে। আক্রোশ কশ্যপের প্রতি—কিন্তু কশ্যপের শঙ্কা, সে আক্রোশ সাধের পুরী অবধি না পৌঁছয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য একদা গিরিগৃহের প্রয়োজন হয়েছিল, সেই গৃহ আজ প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়। সিগিরিয়া ছেড়ে কশ্যপ শত্রুর সম্মুখবর্তী হলেন। কখন ওরা আঘাত হানবে, সে অপেক্ষায় রইলেন না—সামনে গিয়ে নিজের তলোয়ারে কণ্ঠচ্ছেদ করলেন। বিজয়ী মোগ্গল্লান পরমানন্দে অনুরাধাপুর ফিরলেন রাজা-প্রতিষ্ঠার জন্য। সিগিরিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হল না। ভাগ্যহত কশ্যপ, শোনা যায়, নিরালম্ব প্রেতমূর্তিতে উদ্দাম বাতাসের সঙ্গে তাঁর স্বপ্ন-অলকায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। অনেক শতাব্দী ধরে ঘুরেছেন এমনি। মানুষজন কেউ ঢুকতে সাহস পেতো না। শেষাশেষি নির্বাণ-মুমুক্ষু কয়েকটি শ্রমণ নিস্তব্ধ শিখরদেশে ধ্যানাসন রচনা করলেন। পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গম্ভীর মৃদু প্রতিধ্বনি উঠত—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

নেমে আসছি। খিল-খিল খিল-খিল—হাসির কলোচ্ছ্বাস পিছনে। চিত্রায়িত কৌতুকময়ীরা কেউ হেসে উঠল নাকি?…না, সেই মেয়ে। উমাপ্রসাদ আর আমি আলোচনা করছি: বাঙালিনী বোধ হয়। চেহারায় তাই মালুম। কিন্তু বাঙালি মেয়ের এত উচ্ছ্বাস দেখিনি তো কখনো! শ্যামল রূপের অপরূপ স্নিগ্ধতা—নাম দিতে ইচ্ছা করে শ্যামা।

ক'দিন পরে মেয়েটিকে অতি আশ্চর্যভাবে আর এক জায়গায় দেখলাম। মস্ত বড় একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে—চেহারায়, প্রতিষ্ঠায়, টাকায়, বয়সে সব দিকেই বড় তিনি। স্ত্রীকে আহ্বান করে পরিচয় করিয়ে দিলেন : মাদার অব টুয়েলভ চিলড্রেন। সেই শ্যামা—কিন্তু কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে বারো সন্তানের মা কেমন করে হয়? শেষটা বোধগম্য হল, বারো সন্তানের আসল জননী স্বর্গীয়া হবার পর শ্যামা সেই স্থলাভিষিক্তা হয়েছে। অদৃষ্টবতী বটে—বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চা-বাগান, রবার-বাগান এবং পুরো ডজন সন্তানের মালিক! কিন্তু সমস্যা রয়ে গেল, সিগিরিয়ায় সে দিনের অনুষঙ্গীটি কে? শ্যামা এখন ব্রীড়াকুন্ঠিতা অতি শিষ্টমূর্তি, তাকে প্রশ্ন করা চলে না।

(৮)

অনুরাধাপুর আর সিগিরিয়া পিছনে ফেলে আরণ্য রাজ্যে আবার একদিন ছুটল আমাদের গাড়ি। বুনো-হাতী, ভালুক আর চিতাবাঘের স্বচ্ছন্দ বিচরণ-ভূমি। আর আছে ভেদ্দা বা বেদিয়ারা —যার অর্থ 'শিকারি জাত'। দৈত্য-দানো ও সাপের পূজক, লঙ্কার আদিতম বাসিন্দা, যক্ষ ও নাগ জাতির যৎসামান্য অবশেষ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিকে অবহেলায় পিছন ফিরে তারা রয়ে গেছে হাজার হাজার বছরের ওপারে। নৃতত্ত্বের ছাত্র মিউজিয়াম ঘুরে ঘুরে দেখেন আদি-মানুষের করোটি-কঙ্কাল—প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যদি তাঁরা জীবন্ত দেখতে চান, সাহস করে ঢুকে পড়ুন গভীর জঙ্গলের এই সব ভেদ্দাপাড়ায়।

জাহাজ-ডুবির পর বিজয়সিংহ উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। যক্ষ-কন্যা কুবেণী বিদেশি কুমারকে ডাঙায় তুলল

বাহুপাশে জড়িয়ে। বিস্রস্ত কেশদাম বুলিয়ে গায়ের জল মুছে দিল।

বিজয় সেদিন প্রতিজ্ঞা করল :

স্বর্ণলঙ্কায় আমার বোনা সমস্ত বীজ পচে ধুয়ে যাবে, একটা ফুলও ফুটবে না চারিদিককার এই শ্যাম ক্ষেত্রে, ফল হয়ে যাবে কটু-বিষাক্ত—যদি কন্যা, কোন দিন তোমার অতুল প্রেমের অমর্যাদা করি।

সর্বনাশা প্রেম—স্বদেশ ও স্বজাতি নগণ্য হয়ে যায় তার কাছে। ঘরশত্রু কুবেণী বারম্বার পিতার রণনীতি ভেদ করে দিচ্ছে—যার ফলে লড়াইয়ে হেরে যক্ষ ও নাগদের দুরারোহ পর্বতে পালাতে হল। লঙ্কার রাজনন্দিনী শুধু নয়—সমুদ্র-চুম্বিত লঙ্কাভূমিও বিজয়ের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ল।

সুধন্য মহাবল মহারাজ বিজয়সিংহ! তাই বলে বিজন সমুদ্র-তীরে বিপন্ন যুবা প্রেম-বিমুগ্ধ যক্ষ-কিশোরীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর এক দিন সুবর্ণ ছত্রছায়াতলে পান্নার ও মনতোতার মণিমুক্তা-বিজড়িত সিংহাসনের উপর বসে সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা মনে রাখবার বিষয় নয়।

পরিত্যক্তা অবমানিতা কুবেণী উত্তুঙ্গ গিরিশীর্ষে উঠে বুকে আঘাতের পর আঘাত হানছে। যে গিরি আজও রয়েছে—সিংহলী ভাষায় তার নাম 'যক্ষিণীর অভিশাপ'। নরনারী সেই পথে যাবার সময় নিশ্বাস ফেলে শিখরের দিকে চেয়ে চেয়ে।

আকাশের দেবতাদের উদ্দেশে বাহু বিস্তার করে বুক চাপড়ে কুবেণী হাহাকার করছে :

লড়াই জিতিয়ে তোমায় রাজা করলাম, তোমার সন্তান ধরেছি আমার গর্ভে—আর, এখন তুমি অন্যের প্রেমে মাতোয়ারা। এই কি ধর্ম হল মহারাজ?

চন্দনবনে যেন অসহ দুর্গন্ধ। চাঁদের আলো গলিত-লোহার মতো। কোকিলের গানে কানে বর্শা বিঁধছে···

শুকনো উঁচু ডাঙা, লঙ্কার সর্বোত্তম ভূমি—বিজয়সিংহ যেখানে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার—সেই সমগ্র অঞ্চল এখন প্রায়-পরিত্যক্ত, ঘন জঙ্গলে দুর্গম। যক্ষিণীর অভিশাপ ফলেছে, প্রাচীনেরা বলে থাকেন। এত ছোট লঙ্কাভূমি—তিন ভাগ তার বনে ঢাকা ; এক ভাগে মাত্র জনালয়।

পিচ-ঢালা নিঃসীম পথ অরণ্য ফুঁড়ে চলে গেছে যক্ষকন্যার আলুলিত কেশে সিঁথিপাটির মতন। পশু ও মানুষ-পশুর রাজ্যে সভ্যতা-শকট অনধিকার প্রবেশ করেছে। হঠাৎ যদি এই সময় বিষাক্ত তীরধনু নিয়ে ভেদ্দারা ছুটে আসে, আর শুঁড় তুলে বন্য হাতীর দল রুখে দাঁড়ায় মোটরের সামনে! আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অনুরাধাপুর নামটা মোহময়—আকাশের তারার নামে নগরীর নাম। সিগিরিয়ার চিত্রশালা দেশ-দেশান্তরে বিস্ময়-বিভ্রম জাগায়। কিন্তু লঙ্কার বাইরে ক'জনে পোলোন্নারুবাকে জানে? সেইখানে চলেছি। পাঁচ-ছ'শ বছর জঙ্গলে মুখ লুকিয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল রহস্য-নগরী। জঙ্গল কেটে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আজকের প্রত্ন-পণ্ডিতেরা তার গুণ্ঠন মোচন করছেন।

বিশ বছর আগেও এদিকে পা বাড়াতে অতিবড় সাহসীর বুক কাঁপত। মাইলের পর মাইল আসতে হত গরুর গাড়িতে। ক্ষীরিবিহার, পদ্মধারা, সাতমহল ও লঙ্কাতিলকের উপরে বড় বড় তেঁতুল-অশ্বত্থ রোদ পোহাত অলস ডালপালা মেলে, কখনো বা বৃষ্টির জলে ভিজত।

অনুরাধাপুরের রাজারা এক সময়ে এখানে এসে থাকতেন। তার পর চোলবাহিনী লঙ্কা-জয় করল। পরাক্রমবাহু অবশেষে দিলেন তাদের তাড়িয়ে। আবার তামিলরা এলো। অনেক শতাব্দীব্যাপী এমনি টানা-পোড়েনের মধ্যে পোলোন্নারুবা বারম্বার ইতিহাসের পাতায় ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। শেষাশেষি, কেমন করে জানি না, পোলোন্নারুবা মানুষের স্মৃতি থেকে একেবারে হারিয়ে গেল; পাঁচ-ছয় শতাব্দীর মধ্যে কোথাও তার উল্লেখ-মাত্র নেই।

জঙ্গল কেটে আবার এখন জনবসতি হচ্ছে। বেরিয়ে পড়ছে প্রাচীন জনপদ-চিহ্ন, বিপুলব্যাপ্ত দাগোবা (স্তূপ)। মানুষের তৈরি বড় বড় হ্রদ—বর্ষার জল যেখানে বাঁধে আটকে রাখা হত চাষের ক্ষেতে সরবরাহের জন্য—সেকালের মতোই জলের ঐশ্বর্য টলমল করছে। হ্রদের উপান্তে নতুন করে চাষবাস শুরু হচ্ছে, সামান্য চেষ্টাতেই চালু হয়ে যাচ্ছে প্রাচীন সেচ-পদ্ধতি। সুপক্ক শস্য-সম্ভারে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌দিগন্তে।

লেকের উপর রেস্ট-হাউসটি চমৎকার। প্রহর খানেক বেলায় সেখানে পৌঁছলাম। লঙ্কার সর্বত্র এমনি সব রেস্ট-হাউসে জামাই-আদরে থাকতে পাবেন। ওরা হাসে হোল্ড-অলের উদরে আমাদের বিছানার সমারোহ দেখে। বেড়াতে বেরোও তোমরা এই রকম বোঝা কাঁধে নিয়ে—খালি হাত-পা নইলে স্ফূর্তি আসে কখনো?

যেখানে যাচ্ছি—সদ্য পাট-ভাঙা ধবধবে বিছানাপত্র, গোলাকার নেটের মশারি ফুলের ঢঙে পাকিয়ে উপরে তোলা। পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর, উপাদেয় আহার্য, অকুণ্ঠ অমায়িকতা—রেস্ট-হাউসের এমনি সব আরামের লোভ দেখিয়ে লঙ্কার পথ দলে দলে মানুষজন বাইরে টেনে আনে।

আপনি এখানে মিস্টার—?

কলম্বোর বড় এডভোকেট ইনি—আমরা মুনি সিংহের বাড়ি উঠেছি, তাঁর পরম বন্ধু। বললেন, শিকারে এসেছি।

শিকারে আরও অনেকে এসেছেন, সাজসজ্জায় মালুম পাচ্ছি। পোল্লোন্নারুবাকে ঘিরে চারিদিকেই প্রায় জঙ্গল। অভিজাত শিকারিরা রেস্ট-হাউসে ওঠেন—শিকার হোক না হোক, দু-চার দিন মজায় কাটে।

নিকোলাস চৌকিদারের নাম। চৌকিদার কিম্বা আর কোন জাঁকালো পদবি, সঠিক বলতে পারব না। লোকটি ভারি তুখড়—চরকির মতো ঘুরছে। ফরফরিয়ে ইংরেজি বলে—পুরানো আমল হলে এই ইংরেজি বলার জন্যই এ মানুষকে চৌকিদার না করে জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বানিয়ে বসাত। সাহেবসুবো বিস্তর এসেছে—নিকোলাসের বড্ড খাতির তাদের সঙ্গে। ভাবখানা যেন প্রাণ হাতের মুঠোয় করে বেড়াচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ছুঁড়ে দিতে পারে যদি তাদের কাজে আসে। আমাদের সঙ্গে সাদামাঠা কথাবার্তা—নিতান্ত যেটুকু নইলে নয়। যেমন, গদির তুলো বেরুচ্ছে—ওরে, বদল করে একটা ভাল গদি এনে দে। আর ফর্সা চাদর ছুটো। রাতে যখন থাকছেন না—মশারির তো দরকার হবে না, কি বলেন ?

বলতে বলতে ছুটে চলে যায়। প্রাতরাশ সেরে ছুটি মেম-সাহেব ছেলে-মেয়ে নিয়ে বেরুচ্ছে, তাদের সেলাম দিয়ে আসে। বছর তিনেকের বাচ্চাটিকেও আভূমি সেলাম। দিবারাত্রি এই তো চাকরি—এত সেলামেও ঘাড় কেন ব্যথা হয় না, তাই ভাবি।

এরই মধ্যে একটু ফুরসৎ বুঝে নিকোলাসকে গিয়ে ধরলাম।

আমাদের ঘরটা একেবারে ওধারে পড়ে গেল যে!

আর নেই—

ঐ তো, বন্ধ রয়েছে একটা ঘর।

বন্ধ ভিতর থেকে স্যার। পরশু এই জোড়া এসেছে।

দু-পাটি সাদা দাঁতের হাসি হেসে বলল, নতুন বিয়ে বলে মনে হয়। খাবার সময়টা ছাড়া ওরা বেরোয় না।

বারাণ্ডায় পা দিলেই লেক, অদূরে পাহাড়, দিগন্তে বনের সমারোহ। এখনই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে রৌদ্র মধুময় হয়েছে। এমনি সময়ে বন্ধ-ঘরের মধ্যে স্বেচ্ছায় আটক হয়ে থাকা—দেহ বা মনের সহজ অবস্থায় মানুষে পারে না। রেস্ট-হাউসের এতগুলো অতিথির মধ্যে নেইও আর কেউ। নিকোলাস ঠাউরেছে ঠিকই। নতুন বিয়ে—গদগদ অবস্থা।

জামা-কাপড় বদলাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে আরও নিঃসংশয় হওয়া গেল। পাতলা পার্টিসন ভেদ করে ওদিককার কথাবার্তা সুস্পষ্ট কানে আসছে। একবার পুরুষের গলা, একবার মেয়ের গলা—কখনো বা এক সঙ্গেই দু'জনের। ভাষার একবর্ণ বুঝিনে—কিন্তু এ বস্তু নির্ঘাৎ প্রেমালাপ। নয় তো আলাপনে কিঞ্চিৎ ছেদ-বিরতি থাকত। পাগল হয়ে বলে যাচ্ছে—সব দেশেরই ঐ এক রীতি—মানে নেই, শুধুই কথা বলার আনন্দ।

প্রত্নকর্তা ডক্টর পর্ণবিতান চিঠি দিয়েছেন, সরকারি গাইড যাতে আমাদের যত্ন করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেন। ড্রাইভার খবর আনল, তাঁর অসুখ—উঠতে পারছেন না।

সঙ্গে সঙ্গেই অভয় দেয়, গাইডের অভাব কি? আমায় ছেঁকে ধরেছিল। খুব নাম-করা একজনকে বলে এসেছি, দুটোয় আসবে। আসবে ঠিক সময়ে—আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আমাদের লঙ্কার লোক ঘড়ি ধরে কাজ করে।

গাইড এসে গেলেন একটা না বাজতেই। ঘড়ি ধরে এসেছেন যখন, লঙ্কার ঘড়ি তবে কি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে? সেটা অবশ্য ভালোই আমাদের দেশের ঢিমেতেতালা ঘড়ির তুলনায়। খাওয়া চলছিল, তাড়াতাড়ি শেষ করে উঠে এলাম।

গাইড সুপুষ্ট এক তাড়া কাগজ বের করে বলেন, পড়ুন।

তাড়ার মধ্যে সেলাই-করা আস্ত খাতাই তিন-চারটে। ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা। এর সিকি-আন্দাজ পড়ে শেষ করতে গেলেও এইখানে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, পোলোন্নারুবা দেখা মুলতুবি থাকবে। সসাগরা ধরিত্রীর দেশে দেশে যত কৃতী মহাজন আছেন, সবাই নিজ নিজ ভাষায় গাইড মশায়কে অকৃপণ সার্টিফিকেট বিতরণ করে গেছেন—সেই সুবিপুল সংগ্রহ। তা ছাড়া গাইড নিজেও আজীবন অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন, স্বহস্তে সবিস্তারে তার চমকপ্রদ বিবরণ লিখে রেখেছেন অজ্ঞ সাধারণের জন্য। তালি-মারা জিনের কোটের এক পকেট থেকে কাগজপত্র উদ্ধার করে আবার আর এক পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন—হাঁ-হাঁ করে এক কথায় আমরা ভদ্রলোকের অসামান্যত্ব স্বীকার করে নিলাম।

ঠারেঠোরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি, যে দরের মানুষ—কত চেয়ে বসেন, ঠিক কি?

লোক চরিয়ে বেড়ান, আন্দাজে ঠিক বুঝে নিয়েছেন। মৃদু হেসে বললেন, কিছু বেশিই দিতে হবে আমাকে। সার্টিফিকেট দেখুন, লাইসেন্স দেখুন—মুড়ি-মিছরি একদর হতে পারে না। এখন এই একটা বাজে—তা ধরুন, ঘণ্টা পাঁচেক ঘোরাঘুরি তো হবেই—

চোখে না দেখেও পুঁথিপত্রের মারফত এই প্রাচীন মহানগরীর অন্ধিসন্ধি উমাপ্রসাদের নখদর্পণে। ঘাড় নেড়ে তিনি সায় দিলেন: নিশ্চয়—সময় অনেক লাগবে।

তবে বুঝুন, কি রকম খাটনি। ছুটো টাকা দিতে হবে।

আমাদের মুখের দিকে সোদ্বেগে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বলেন, একুনে সাত আট মাইল ঘোরা হয়ে যাবে—হিসেব করে দেখুন। উঁচু-নিচু ভাঙাচোরা পথ—বুড়ো হয়েছি, আর পেরে উঠি নে। আর বিবেচনা করুন—সবাই আসে হরিণ মারতে, এসব দেখবার মানুষ আজকাল বড় কম। আমাদের চলে কিসে? যাকগে—এক টাকা পঞ্চাশ সেন্ট দেবেন, আর কমাবেন না।

জন্ম-জন্মান্তের বাঁকে যে সমাজ আর যে মানুষদের ছেড়ে এসেছি, হঠাৎ যেন তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ি। পুরানো কাল কথা বলে, প্রস্তরায়িত আত্মীয়েরা স্বাগত-সম্ভাষণ জানায়।

গিরিবিহারে (গলবিহার) পাহাড় কেটে সারি সারি মূর্তিগুলো —তার মধ্যে আনন্দকে ভুলতে পারব না কোনদিন। বোধিতরু-মূলে ধ্যান-নিস্তব্ধ বুদ্ধ, সারনাথের মন্দির-গর্ভে মহাবাণীর উদ্গাতা বুদ্ধ—এবং কুশীনারায় দক্ষিণ শিয়রে প্রস্তর-উপাদানে বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণ। প্রভু বুদ্ধের শেষ-শয্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আনন্দ।

এ ছবি মনে আঁকা হয়ে রইল। আধ-নিমীলিত দৃষ্টি। শত শত বৎসরের ঝড়বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেছে, অরণ্য কতবার বিলুপ্ত করে ফেলেছে বনস্পতির বিপুল ছায়ান্ধকারে—অবরুদ্ধ মহাশোকে নিস্তব্ধ-মূর্তি আনন্দ তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। শতাব্দী ও সমুদ্র-ব্যবধান পার হয়ে দুটি মানুষ এই এসে দাঁড়ালাম—আমি একবর্ণ মিথ্যে বলছিনে—নিঃশব্দ বাক্যে তিনি মর্মব্যথা পরিপূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করলেন আমাদের কাছে। গ্রানাইট পাথর এমন জীবন্ত করে তুলতে পারে শিল্পীর বাটালি! চোখ খুলে, কখনো বা আধেক বুঁজে—এগিয়ে পিছিয়ে নানা দিক দিয়ে নানা

রকমে দেখছি—প্রতি বারেই এক এক নতুন চেহারা। ঘুঘু ডাকছে কোন দিকে ক্লিষ্ট একটানা সুরে, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ফালি-ফালি রোদ এসে পড়েছে। ওষ্ঠ দৃঢ়-সম্বদ্ধ, দু-হাত আড়াআড়ি ভাবে বিন্যস্ত বুকের নিচে দিয়ে—আনন্দ, সুপ্রাচীন কুশীনারার বিহ্বলমূর্তি তোমায় কতকাল পরে আজ সুবর্ণদ্বীপে এসে দেখে গেলাম। ডান পায়ে বেশি ভর, বাঁ পায়ে কম—পায়ের এই চাপের তফাৎটুকু অবধি লক্ষ্য করা যায়। সর্বলোক-পূজিত অমিতাভ বুদ্ধ—সকল গুণ ও সর্বসৌন্দর্যের আধার—তুচ্ছ পার্থিবতার বহু উর্ধ্বে বিরাজিত তিনি। আমরা ঐহিক সামান্য মানুষ—দুঃখ-শোক ব্যথা-বেদনায় জর্জর। বিশাল মহোন্নত তেজোপ্রদীপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যে শোকাহত আনন্দ, তোমায় আজ প্রাণ ভরে ভালবেসে ফেললাম।

বিশাল এক পদ্মফুল। পদ্মের রংটা এবং কোমলতাও বুঝি ফুটে উঠেছে কঠিন কালো পাথরে। পুরললনাদের স্নানশালা।

উমাপ্রসাদ বলে উঠলেন, সাতমহলের দরজায় মেয়েরা। সরে আসুন—ওঁরা সন্ধ্যাস্নানে বেরুতে পারছেন না।

অবস্থা এমনই বটে। এই রহস্যপুরীর অলিগলিতে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় ভুলে যেতে হয়, বর্তমান শতাব্দীর উগ্র জীবন্ত মানুষ আমরা। দেখছিলাম ঠাউরে ঠাউরে পাথরের পাঁপড়িতে অলক্তক-চিহ্ন লেগে আছে কোন্‌খানে—এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম, গায়ের উত্তরীয় কি পায়ের নূপুর কেউ ফেলে গেছেন কিনা মনের ভুলে।

গাইড বকবক করে যাচ্ছেন :

অনুরাধাপুর ভেঙে-চুরে ফেলেছে চোলবাহিনী। চোলদের এক তরুণ সেনানী এসে পড়লেন পোলোন্নারুবায়।

কি করবে তোমরা—স্বেচ্ছায় রাজকর দেবে, না শ্মশান-দশা ঘটাব অনুরাধাপুরের মতো?

এই পদ্মধারার অনতিদূরে এসে সেনাপতি থমকে দাঁড়ালেন। স্নান করে উঠছে অপরূপ সুন্দরী এক বধূ। পদ্মের পাঁপড়ির এক একটা ধাপ ধরে জলতল থেকে ধীরে ধীরে যেন বিকশিত হল সিক্ত-অঙ্গ আর একটি পদ্ম। সেনাপতির চোখে পলক নেই—গাছের নিচে সেইখানে অলক্ষ্যে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়-হস্তী-হংসাদি-খোদিত বিচিত্র চন্দ্রশিলার উপর সিক্ত পায়ের আলিম্পন এঁকে এঁকে বধূ গিয়ে উঠলেন অদূরের সুরম্য হর্ম্যে।

কাজকর্মে মন নেই সেনাপতির—সময়ে অসময়ে ঐখানে এসে দাঁড়ান। গবাক্ষপথে এক দিন কিঙ্করীর সঙ্গে চোখোচোখি। ইঙ্গিতে কাছে ডেকে গোধন ও মৎস্যখচিত এক মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে দিলেন।

কি আপনার আকাঙ্ক্ষা পরদেশি তরুণ?

শ্রীমতীর সেবাকার্যে আমায় একটু অংশীদার করে নাও।

ফটকে সারাদিন সারারাত্রি পাহারা—কোন পুরুষ এই প্রাসাদে প্রবেশ করতে পায় না।

সেনাপতি নিশ্বাস ফেলে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ভাগ্যবান স্বামীটি ছাড়া—

তিনিও অনুপস্থিত। বাণিজ্য-ব্যাপারে অনেক দিন ভারতবর্ষে গিয়ে আছেন।

শ্রীমতীই তবে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসুন না কোন এক সময়।

কিঙ্করী একটু ভেবে বলল, সন্ধ্যাকালে একবার মাত্র ক্ষীরিবিহারে তিনি ধূপ-দীপ দিতে বেরোন। চেষ্টা করুন—সেই সময়ে সাক্ষাৎ হতে পারে।

রাণী সুভদ্রার স্থাপিত ক্ষীরিবিহার। আয়তনে বড় নয়, কিন্তু দুধের মতো সাদা ধবধবে। ক্ষীর বলতে দুধ বুঝায় ওদেশে।

গোধূলির ম্লান আলোয় সদাগর-বধূ বিহারের অনুচ্চ বেষ্টনীর উপর দীপ সাজাচ্ছেন, সেনাপতি সহসা নতজানু হয়ে তাঁর পথ আটকালেন। ঘৃণায় বধূ নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করলেন তাঁর গায়ে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে আবার প্রাসাদ-শীর্ষে গিয়ে উঠলেন।

সুন্দরীর প্রেমভোগী ভাগ্যবান সেই প্রবাসী সদাগরের প্রতি বিদ্বেষে সেনাপতির অন্তরাত্মা জ্বালা করে উঠল। জাদুবিদ্যার চর্চা তখন দেশব্যাপ্ত। সেনাপতি এক ধুরন্দর জাদুকরের শরণ নিলেন। শ্মশান থেকে শব তুলে আনা হল—শৃগাল-গৃধ্র যার দেহ স্পর্শ করে নি। মন্ত্রবলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হল শবদেহে। তখন সে আর মানুষ নয়—অসীম শক্তিধর দৈত্য।

কি আদেশ ?

জাদুকর বলল, বায়ু-বাহিত হয়ে সদাগরের কাছে চলে যাও। তরবারি দিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে আনো।

ব্যাপারবাণিজ্য অন্তে সদাগর স্বদেশে ফিরছে। ধীর বাতাসে বঙ্গোপসাগরের বুকে দুলে দুলে আসছে বাণিজ্য-তরী। ঝড়ের মতন আকাশ বিমথিত করে অস্ত্র হাতে দৈত্য আসছে—সদাগর সমস্ত বুঝলেন। উদাত্ত কণ্ঠে অভীঃ মন্ত্র উচ্চারণ করলেনঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

যেন অব্যর্থ-লক্ষ্য শূল নিক্ষিপ্ত হল। থর-থর কাঁপতে লাগল দৈত্য অহিংস-মুনির নাম-উচ্চারণে। হাতের তরবারি সমুদ্রজলে পড়ে গেল। ফিরে এলো সে মলিন মুখে।

মন্ত্র পড়ে জাদুকর আবার তাকে উত্তেজিত করে। যথাপূর্ব সে ফিরে আসে। আবার মন্ত্র, আবার পরাজয়। বিক্ষুব্ধ বিরক্ত দৈত্য শেষটা মুণ্ডপাত করল সেনাপতি ও জাদুকরের।

শুনুন—আশ্চর্য খবর। ঋষি অগস্ত্যকে দেখে এসেছি। হাজার হাজার বছর পরে তাঁর সন্ধান পেলাম।

হিমালয় ও বিন্ধ্যে পাল্লা চলছিল—কে বড়? পাল্লা দিয়ে উভয়ে মাথা তুলছিল। বিন্ধ্যের পারবর্তী অঞ্চল অন্ধকার হয়ে গেল। সর্বনাশ! আলোক-বিস্তারের কি উপায় করা যায় সে দেশে?

বিন্ধ্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন অগস্ত্য। ভক্তিনত বিন্ধ্য সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। প্রসন্ন মুখে ঋষি আশীর্বাদ করলেন।

দক্ষিণ অঞ্চলে চলেছি। বুড়ো মানুষ—বেশি চড়াই ভাঙতে পারিনে। ফিরে না আসা অবধি কষ্ট করে মাথাটা নিচু করে থেকো বাপু—

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হয়ে গেল, সত্যবদ্ধ বিন্ধ্য নতমস্তকে অপেক্ষা করে আছে। আর্য-সংস্কৃতির বর্তিকা নিয়ে অগস্ত্য চলে গেলেন দক্ষিণ দেশে। আনত বিন্ধ্যের উপর দিয়ে তারপর অসংখ্য আর্য-অভিযান চলেছে। পুণ্যশ্লোক কত সাধুসন্ত, কীর্তিমান কত শাসক-দিগ্বিজয়ীর গতায়াত হল—কিন্তু অগস্ত্য আর ফিরলেন না। পুরাণকার তাঁর সম্বন্ধে নীরব।

মাসের পয়লা যাত্রানাস্তি—অগস্ত্য ঐ তারিখে বেরিয়েছিলেন বলেই। শঙ্কিত পঞ্জিকা চায় না, দুঃসাহসী বৃদ্ধ ঋষির পরিণাম আর কোন মানুষের অদৃষ্টে ঘটে! কোথায় তিনি হারিয়ে গেলেন? মেরে ফেলল কি হিংস্র কোন বন্য গোষ্ঠী—আর্যধর্ম-প্রচারণে যাদের মধ্যে তিনি গিয়ে পড়েছিলেন? কোন্ খানে তাঁর সমাধি—দাক্ষিণাত্যের ঘন অরণ্যে, লবণ-সমুদ্রজলে, নিভৃত কোন পর্বত-সানুতে?

সেই অগস্ত্যকে প্রত্যক্ষ করে এলাম—অস্তায়মান সূর্যের বিচিত্র বর্ণালির মধ্যে ধ্বংসীভূত পোলোন্নারুবার উত্তর সীমানায় নিঃসীম হ্রদের অনতিদূরে। মহাতেজা ঋষি তবে কি ভয়াবহ পথ অতিক্রম

করে সুবর্ণদ্বীপেও এসেছিলেন মহা-ভারতের বাণী নিয়ে? সমুদ্র যিনি গণ্ডূষে পান করেছিলেন, সভয়ে সমুদ্র তাঁর পথ করে দিয়েছিল। এবারে, দেখলাম, তাঁর মুখ ফেরানো উত্তরে আর্যাবর্তের দিকে। অগস্ত্য বলে, আবার তামিল-মুনি বলেও পরিচয় দেয় কেউ কেউ। অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারত থেকে এসেছিলেন এই মুনি। পাহাড় কেটে খোদাই-করা—লম্বায় আমাদের সাধারণ মানুষের দেড়গুণ অন্তত। পাষাণ-মূর্তি তাকে কে বলবে? দেখুন, চেয়ে দেখুন, দু-হাতে পুঁথি ধরে আছেন—মুদিত-আঁখি, শান্ত সমাহিত, অন্তরখানি যেন ফুটে বেরিয়েছে মুখের উপর। নিরীক্ষণ করুন কিছুক্ষণ ধরে—এ মূর্তি জীবন্ত বলে মনে হবে। সেই পাহাড়ের সামনে বিনম্র নতশীর্ষ আমরা বসে পড়লাম—হাতের পুঁথি থেকে ঋষি অগস্ত্য নিঃশব্দ নির্ঘোষে ভারত-বাণী শোনাচ্ছেন লঙ্কার অদৃশ্য অতীত নরনারীদের কাছে। সেই বাণী বহু কালান্তরে আমাদের মর্মে এসে পৌঁছল।

ছবি তুলবেন না সাহেব, খবরদার! আইনে মানা।

পাহারাদার নিষেধ করল। কিন্তু কমিশনারের অনুমতিপত্র রয়েছে আমাদের সঙ্গে। কাল বিস্তর জরুরি কাজ নষ্ট করে প্রত্নোন্মাদ কমিশনার পর্ণবিতান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধাপুর ও মহিনতাল ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুই না বলে উমাপ্রসাদ ক্যামেরা গুটিয়ে নিলেন।

পাহারাদার লোকটি নিজেই তখন স্বর নরম করে বলে, তা নিয়ে নিন একটা ছবি। আপনারা দূরদেশের লোক। মানা আছে বটে, তবে তুলছেও অনেকে।

উচ্চবাচ্য না করে মন্থর পায়ে আমরা ফিরছি। দ্বীপান্তরে পরবাসী স্বজনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটেছে, সেই আনন্দে মন ভরে গেছে—ফোটোগ্রাফে আর উৎসাহ নেই।

পাহারাদার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সহসা কাতর হয়ে বলে, ছবি তুলে নিন স্যার, ফিরে আসুন—

তবে মানা করলে কেন ?

আইনে আছে, কি করব ?

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, আইনে মানা না থাকলে আমাদের কি কেউ পয়সা দিত ? সাহেবসুবো আসছে—সকলকে মানা করি—তারা দু'টাকা এক টাকা দিয়ে ছবি তুলে নিয়ে যায়।

আসন্ন সন্ধ্যায় প্রাচীন হ্রদের ধারে ধারে রেস্ট-হাউসের দিকে ফিরে চলেছি।

স্যার !

এত কম আলোয় ছবি ভালো হবে না বাপু।

স্যারেরা বোধ হয় রাগ করে যাচ্ছেন। আমার মন খারাপ হয়ে থাকবে। দেখুন, ও-কথা আমি সবাইকে বলে থাকি।

অতএব ছবি তোলায় তার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে সপ্রমাণ করতে হল, আমরা রাগ করি নি। একটা লোক মন খারাপ করে পড়ে থাকবে, কারো পক্ষে সেটা উচিত কর্ম নয়।

ঘরে পা দিয়েই বুঝলাম, ও-ঘরের প্রেমালাপ তখনো চলছে। প্রেমিকরা ক্লান্ত হন নি—আলাপন বরঞ্চ তুমুলতর। চোখে দেখতে পাই নি, কিন্তু অনুমান করা যাচ্ছে প্রেমিকরা পালোয়ান। দেহে তাগত না থাকলে দিবসব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন প্রেমচর্চার পরেও কণ্ঠের এতদূর শক্তি সম্ভবে না।

এখন আর কাজকর্ম নেই। দশটার কাছাকাছি ট্রেন। ঐ ট্রেনে কলম্বো ফিরব। মাঝের এই সময়টা লেখা যাক কিছু। খাতা খুলে এই লেখা পড়তে পড়তে আবার কোন দিন

পোলোন্নারুবায় মনে মনে বিচরণ করব। বারাণ্ডার নিরিবিলি সর্বশেষ প্রান্তে বসে পড়লাম।

লেকের জলে ঝিলিমিলি রঙ ফলিয়ে সূর্য অস্ত গেল। ওপারের পাহাড়শ্রেণী ধূসর—এবং ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। জোলো হাওয়ায় দিনের ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল। প্রশান্তি চারিদিকে। টিকটিকি ডাকল একবার।—এই রে, ডায়নামো চালিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রের পেষণে নিঃশব্দতা বিচূর্ণিত হচ্ছে বিপুল আর্তনাদ করে। আলো-ঝলসিত হয়ে উঠল মুহূর্তে সমস্ত রেস্ট-হাউস।

কখন চাঁদ উঠেছে, বড় বড় গাছের ফাঁকে চাঁদ মধুর হাসি হাসছে আমার দিকে চেয়ে। বিজয়া-দশমী আজ। হাজার হাজার মাইল দূরে আমার বাংলাদেশে মানুষ-জন প্রীতি-আলিঙ্গন করছে। এখানে বঙ্গসন্তান আমরা এই দুটি। কোন দিকে গেলেন উমাপ্রসাদ, কোথায়? ঘরের ভিতর বসে পত্র-রচনায় ব্যস্ত। আজ যে বিজয়াদশমী—মনে আছে?

বিষম হুলস্থুল সহসা। রেস্ট-হাউসের সকলেই সেখানে। আমরাও ছুটলাম। প্রেমিকদ্বয় বেরিয়ে পড়েছে। পুরুষটির জামা ছেঁড়া। মুখের উপরটা খুবলে খুবলে নিয়েছে যেন, রক্ত বেরুচ্ছে। হাতে বন্দুক এডভোকেট শিকারিটি সবে ফিরছেন, পুরুষটি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরল।

দেখুন—আমার অবস্থাটা দেখে রাখুন ভাল করে। কলম্বোয় গিয়ে মামলা করব, সাক্ষি দিতে হবে আপনাকে।

এডভোকেট রূঢ় দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে উঠলেন, এ সব কি কেলেঙ্কারি হচ্ছে বলো তো? ছি-ছি!

মেয়েটি ঘৃণিত চোখে পুরুষের দিকে চেয়ে বলে, কেলেঙ্কারি ও-ই তো করছে। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া চলছিল খিল এঁটে দিয়ে। ও কেন বাইরে বেরিয়ে লোক হাসাচ্ছে?

হিড়হিড় টানছে তার কামিজের কলার মুঠো করে ধরে। টেনে সত্যিই নিয়ে চলল। বলে, ঘরোয়া কথাবার্তা দশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছড়াতে দেবো না। কিছুতে না।

এমন বাঘা এডভোকেট—তিনিও দেখলাম, আশ্রয়প্রার্থীকে ঠেকাতে পারলেন না। মালুম হচ্ছে, চেনা মানুষ তিনি উভয়েরই। মেয়েটার কথাতেই সায় দিয়ে বললেন, সেই ভালো। ঘরে যাও বীরবর্ধন। এটা সরকারি রেস্ট-হাউস—

আমাদের দিকে একনজর চেয়ে বললেন, আর বিদেশিরা সব রয়েছেন এখানে।

প্রেমিকা-কবলিত বীরবর্ধনের মুখের সেই চেহারা মনে পড়লে আজও বড় কষ্ট হয়।

দুর্ধর্ষ রাজা পরাক্রমবাহু। শুধু লঙ্কাদ্বীপ বলে নয় ভারতের অনেক অঞ্চলও তাঁর করায়ত্ত। যাকে শত্রু বলে ভেবেছেন, তারই মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন তিনি। নিঃশেষে শত্রুবধ তো করেছেনই—ভাইপো-ভাগনেদেরও রেহাই দেন নি। তারপর একদিন রাজা উপলব্ধি করলেন, কেউ তাঁর আপন নেই ত্রিভুবনে। বিশাল সাতমহল প্রাসাদে অগণ্য রাণী ও পরিজনদের মধ্যে তিনি একা। ভারতের কলিঙ্গ দেশ তাঁর বিশেষ অনুগত; সেখানে চিঠি লিখে পাঠালেন, একটি পরম সুকুমার ছেলে পাঠাও—তাকে যুবরাজ করব। সেই ছেলে নিঃশঙ্কমল্ল।

নিঃশঙ্কমল্ল প্রাচীন প্রাসাদে থাকলেন না। শক্তি ও বিত্ত আছে—পুরাণো জায়গায় পড়ে থাকা অপমানকর তাঁর পক্ষে। বহুবিস্তৃত পুরী-প্রাচীরের বাইরে তিনি খুব বড় এক অট্টালিকা তৈরি করলেন। সে এই রেস্ট-হাউসের এলাকা।

জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রাসাদ-শিখর থেকে পুরস্ত্রীরা মুগ্ধ চোখে হ্রদের দিকে চাইতেন, সাহসিকা কেউ কেউ ঝিকিমিকি জলের উপর গোপন নৌকাবিহারে বেরুতেন পিছনের দ্বারপথে বেরিয়ে এসে। সাত শ' বছর পরে দূরদেশের মানুষ আমি আজ রাত্রে তাঁদেরই মতো হ্রদশোভা দেখছি; পুরাণো মহাবিচিত্র পরিবেশের এক কোণে একাকী বসে বসে সারাদিনের ভ্রমণ-কথা লিখে রাখছি।

নিঃশঙ্কমল্লের মৃত্যু হল। নগরী শোকাচ্ছন্ন। রাজপুরীর প্রাঙ্গণে ছত্রছায়ায় প্রস্তরপীঠের উপর বসে তিনি নৃত্য ও সঙ্গীত উপভোগ করতেন—সেই প্রাঙ্গণ একেবারে নিঃশব্দ। সেকালের সেই শোকতিথি-পালন জনহীন অরণ্যাকীর্ণ পোলোন্নারুবায় আজও চলছে যেন।

মৃতদেহ এনে রাখা হয়েছে দরবারের পাশের কক্ষটিতে। গাইড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন—জ্যোৎস্নার মধ্যে জায়গাটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। মধু-মাখানো হয়েছে রাজদেহে—আর নানারকম সুগন্ধি আরক। সমাধি-সময় পর্যন্ত শব যাতে অবিকৃত থাকে।

শিষ দিয়ে দিয়ে অলিন্দে নামিয়ে আনা হল শিক্ষিত পারাবত-দল। মধুসিক্ত ভাত বড়ির মতো করে পরম যত্নে তাদের খাইয়ে দিল। পায়ের ঘুঙুরের সঙ্গে এক এক লিখন দিল বেঁধে—ভারতবর্ষ থেকে নিঃশঙ্কমল্লের জ্ঞাতি-কুটুম্বরা যেন অতি সত্বর চলে আসেন রাজোচিত সমাধি-ব্যবস্থায়। হ্রদের প্রান্তে এসে উত্তরমুখো উড়িয়ে দেওয়া হল পারাবত-দূতদের :

যাও পাখি, দেশ-দেশান্তর সমুদ্র-পর্বত পার হয়ে উড়ে চলে যাও—

নিঃশঙ্কমল্ল বলেছিলেন, আমার সুবর্ণদ্বীপে এক হাত বন্ধ্যাভূমি পড়ে থাকবে না, বৃষ্টিজলের এক কণিকা বিনা কাজে সাগরে গড়িয়ে

পড়বে না। কয়েদখানার কবাট খুলে দেওয়া হল—কয়েদি এবং অসংখ্য শ্রমজীবী একত্রে বড় বড় বাঁধ বেঁধে জল আটকাল। পোলোন্নারুবার হ্রদ এবং সমগ্র লঙ্কাব্যাপ্ত আরও এমনি শত শত—সেই উদ্যোগের ফল।

একটা রাত্রিচর পাখি তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে ডেকে ডেকে উড়ে গেল এপার থেকে ওপারের দিকে। শিউরে মুখ তুললাম। জ্যোৎস্নায় হ্রদের জল জ্বলছে যেন। আলো দেখা যায় কিসের? নৌকো বেয়ে চলেছে বুঝি কেউ? পাথরের স্তূপ মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়েছে অতিকায় কুমীরের মতো—নৌকো এঁকে বেঁকে চর কাটিয়ে যাচ্ছে।

ডিনার-পর্ব চুকে গেছে—আমরা খেয়াল করি নি। আমার তাতে অসুবিধে নেই। শরীর বেজুত লাগছে। বিস্তর ঘোরাঘুরি হয়েছে সমস্তটা দিন; সারা রাত্রি আবার ট্রেনে জাগতে হবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে বাড়াবাড়ি যদি কিছু ঘটে, বিপদের অন্ত থাকবে না।

খোঁজ করে এতক্ষণে এইবার আমাদের ডাকছে।

উঁহু, খাবো না তো—

একেবারে কিছু না?

না—

নিকোলাস শুনতে পেয়ে নিজে ছুটে এল।

কিছু খাবেন না—ছি-ছি, একটা দিনের জন্য এসে কি লজ্জা দিয়ে গেলেন বলুন তো!

তোমার কি লজ্জা?

আমার নয়, তবে কার? তিরিশ বছর আছি—এ রেস্ট-হাউস

আমারই বলতে পারেন। কত লোকজন আসে, কত প্রশংসা করে—আপনারা দেশে ফিরে নিন্দেমন্দ করে বেড়াবেন।

শরীর একটু খারাপ হয়েছে, তাতে নিন্দের কি হল? পেটের গোলমাল নয় যে, বলব, তোমার খাওয়ানোর দোষে ঘটেছে।

নিকোলাস ধরে পড়ল, তবে খেতেই হবে স্যার। উপোস করতে দেবো না। আর কি আসবেন লঙ্কায়? এলেও দুর্গম এই পোলোন্নারুবায় কি আসবেন? সে হবে না—কত কষ্ট করে ঘি-ভাত রান্না করলাম, আপনাদের চেখে দেখতে হবে।

এর সিকির সিকি খাতির দিনমানে দেখি নি তো। এখন ভিড় পাতলা—অনেকগুলো দল সন্ধ্যার আগে সরে পড়েছে। যে ক'টি আছে, দরজায় খিল এঁটেছে ডিনার সেরে। এ সব অঞ্চলে সকাল সকাল শুয়ে পড়ার রেওয়াজ। বিশ বছর আগেও বুনো হাতীর চলাফেরা ছিল—কি জানি, পুরাণো আবাসভূমি দেখতে তাদের দুটো-একটা যদি ছিটকে এসে পড়ে অদূরের অরণ্যভূমি থেকে!

ডিনারে আমাদের ডাকো নি কেন?

নিকোলাস আমতা-আমতা করে বলে, ঐ যে ঘি-ভাতের কথা বললাম, ওটা আপনাদের দু'জনের জন্য আলাদা। সবাইকে দিয়ে পারব কেন? নিরামিষ জিনিষ পছন্দও করবে না ওরা। আপনারা হলেন একেবারে আপন লোক—আমার দেশের মানুষ—

ভারতীয় তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই চাকরি করি বটে, কিন্তু আমার পিতৃপুরুষেরা একদিন এ দেশ তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন। চোলরাজ রাজেন্দ্রের কথা জানেন—আমরা তাঁর অমাত্যগোষ্ঠী।

খাবো না—তবু খানাঘরে গিয়ে বসতে হল নাছোড়বান্দার হাত এড়াতে না পেরে।

কালো পাথরের নিরলঙ্কার শিবদেউল দেখতে দেখতে গাইডের মুখে একবার শুনেছিলাম চোলদের প্রসঙ্গ। বুনো হাতীর চেয়েও বর্বরতর আক্রোশে তারা বিচূর্ণিত করেছে অগণিত প্রাসাদ-মন্দির, কালজয়ী শিল্পৈশ্বর্য। সোনার তাল ভারে ভারে লুঠ করে সমুদ্র-পারে নিয়ে গেছে।

নিকোলাসের দু-চোখে আগুন ছুটল।

সোনা-চোর? ওরা এই কলঙ্ক দেয়, তা জানি। লোভী ছিল না তারা। মন্দিরের সোনা ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ে দিয়েছিল লেকের জলে, একটুকও নিয়ে যায় নি। জল ছেঁচে ফেল, সোনা পেয়ে যাবে।

কিন্তু ঐ দিগ্‌ব্যাপ্ত জলরাশি ছেঁচে ফেলা, নিঃশঙ্কমল্ল হয়তো পারতেন—ক্ষীণশক্তি আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কোনক্রমে। তাল তাল সোনার প্রতি লোভান্বিত হয়েও অবস্থা বিবেচনায় চুপ করে রইলাম।

কিঞ্চিৎ শীতল হয়ে নিকোলাস বলল, মণিমুক্তা সোনারূপা ঐশ্বর্যবিলাস কিছুই থাকবে না। থাকবেন শিব এবং ভক্ত। থাকবেন ধর্ম। চারিদিককার ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের মধ্যে সাদামাটা শিবদেউলটা দেখলেন তো—চোখে দেখেই বুঝবেন, চোলরা কি চেয়েছিল, কেন ভেঙেছিল ওদের মণিমাণিক্যের অট্টালিকা।

কোটের নিচে থেকে সহসা পৈতে বের করল। নামটা নিকোলাস (এমন বিদেশি নাম লঙ্কাবাসী অনেকেরই), পোশাক পুরোপুরি বাবুর্চি-সুলভ—এ হেন মানুষের গলায় এমন ধবধবে পৈতের গোছা প্রত্যাশা করা যায় না। কেউ জানে না নিকোলাস কখন সাবান দিয়ে পৈতের পরিমার্জনা করে, যেমন খবর রাখে না নিকোলাসের ঐ বিপুল গ্রন্থ-সংগ্রহের। বিস্তর তামিল পুঁথি। ইংরেজি বইও আছে। পাতা উল্টে দেখি—ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও ভূগোল সম্পর্কীয়।

নিকোলাস নিম্ন কণ্ঠে বলে, তোমরা ভারতের মানুষ, হিন্দু, আমার স্বজাতি-স্বগোত্র। দুঃখের কথা বলছি শোন—

চারিদিকে খরদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল, কেউ নেই কোথাও। বলে, বিদেশি বলে এরা আজ আমাদের ঠেলে দিচ্ছে। রাজেন্দ্র চোলের মহামাত্যের বংশধর আমাকে রেস্ট-হাউসের চাকরগিরি করতে হয়। কিন্তু আগে তো লঙ্কা আর ভারত এক দেশ ছিল, মাঝে সমুদ্র ছিল না—বিদেশি হলাম আমরা তবে কিসে?

ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন বটে তাই। পুরো ভারতবর্ষ নয় – দাক্ষিণাত্য-অংশটা। কিন্তু সে তো অনেক কালের কথা।

আজ্ঞে হ্যাঁ–

আমাদের আশ্চর্য করে দিয়ে রেস্ট-হাউসের চৌকিদার বলে, খুব বড় মহাদেশ—গণ্ডোয়ানা ছিল তার নাম। সমুদ্র ছিল আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে। সেই আমল থেকেই আমরা এদেশবাসী। — এইসব পুরাণের বইয়ে আছে। বিশ্বাস করতে পারছেন না? সময় থাকলে পড়ে মানে করে বুঝিয়ে দিতাম।

লঙ্কা ও দাক্ষিণাত্য যখন এক ছিল—কত কাল আগে তার লেখাজোখা নেই—বসুন্ধরা একদা কাঁপতে লাগল ঘন ঘন। মাটি ফেটে চৌচির। পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় অসংখ্য আনন্দিত জনপদ—এদিকে বঙ্গোপসাগর ওদিকে আরব-সাগর উচ্ছল গ্রাস মেলে জলতলে সমস্ত নিশ্চিহ্ন করল। সেই প্রলয়-কলরোলের মধ্যে শঙ্খ বাজাতে বাজাতে শিবলিঙ্গ মাথায় দলে দলে মানুষ এদিকে-ওদিকে ছুটতে লাগল। ওপারেই বেশি—এপারে অল্প কয়েকজন মাত্র আশ্রয় নিল। সেই থেকে এরা আলাদা হয়ে আছে ওপারের আপন-জনদের কাছ থেকে।

ইতিহাস স্বীকার করে না, কিন্তু নিকোলাসের পুরাণে আছে।

মোটর বারাণ্ডার ধারে এসে দাঁড়াল। ট্রেনের সময় হয়ে এল, দেরি করলে চলবে না। জিনিষপত্র বাঁধা ছিল, মহামাত্যের বংশধর নিকোলাস নিজেই কাঁধে বয়ে তুলে দিল।

আমরা উঠছি—সেই সময় বলল, ছেলেবেলা থেকে সাধ, একবার ভারতে যাব। সে আর কিছুতে হয়ে ওঠে না।

পথ বেশি নয়। গেলেই পার।

ঠিক বলেছেন। জোর করে বেরিয়ে পড়া উচিত। পথঘাট নদী-খাল পাহাড়-পর্বত শহর-বাজার সমস্ত আমার জানা। দেখলেন তো, কত বই আছে ভারত সম্বন্ধে। শুধু একটিবার চোখে দেখে আসা। তা কিছুতে সময় করতে পারিনে।

প্লেনের ব্যবস্থা হয়ে এখন তো আরও কম সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখে শুনে তিন-চার দিনের মধ্যেও ফিরতে পার।

নিকোলাস বলে, তাই যাব। আমার বাবা সারা জীবন যাব-যাব করে গেছেন। শুনেছি, তাঁরও বাবা যেতে চাইতেন। আবার সেই ঠাকুরদাদার বাবাও। তা মরবার আগে নিশ্চয় যাব আমি।

কিছু হাতে গুঁজে দেওয়া গেল। নিকোলাস চমকে ওঠে :

পাওনা তো আপনারা মিটিয়ে দিয়েছেন।

তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। বড্ড আনন্দ পেয়েছি তোমার কথাবার্তায়।

নিকোলাস কাতর কণ্ঠে বলে, আপন-লোককে একটা দিন খাইয়ে হাত পেতে তার দরুন টাকা নিলাম—সে-ই আমার কত বড় লজ্জা! রেস্ট-হাউসের পাওনাগণ্ডা আমারই তো মিটিয়ে দেবার কথা। কিন্তু টাকা রাখতে পারিনে—ক'টাকাই বা এরা দেয়! না স্যার, এর উপরে বখশিস দিয়ে আর আমার অপরাধ বাড়াবেন না।

প্রশান্ত সমুদ্রের কিনারে হংকং শহর—সেইখানে শুধুমাত্র একদিন মেয়েটিকে দেখেছিলাম। বন্দরের বেসাতিনী—নোংরা চালচলন। চেহারা ভাল মনে নেই, তবু কেমন ছবি হয়ে মনে মনে ঘুরে বেড়ায়।

মস্ত বড় হোটেল। আমার ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্র ঠিক নয়, খাঁড়ি। আসল হংকং খাঁড়ির ওপারে। পাহাড়ের গায়ে থরে থরে ঘরবাড়ি সাজানো। সন্ধ্যার আলো ঝলমলিয়ে ওঠে—সে অবশ্য সব শহরেই দেখে থাকেন—এখানে লাল-নীল-সবুজ রঙিন আলো বিস্তর। সাগর-কিনারে নানা রঙের মালা পরে সুন্দরী আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জাহাজ ভিড়িয়ে দু-দণ্ড রসালাপ করুন, দেখুন-শুনুন দু'দিন চারদিন। সাধ্য কি আপনি না থেমে চোখের দেখা দেখেই বেরিয়ে পড়বেন।

তবে ঐ দুটো কিম্বা চারটে দিনই ভালো। ঝলমলে পোশাকের নিচে তারপরেই আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। অন্তরাত্মা পালাই-পালাই ডাক ছাড়ে। আমার অন্তত তাই হয়েছে—আটকে পড়েছি, প্লেন পাচ্ছিনে। যে কোম্পানির ফিরতি-টিকিট, কোন গোলমালে তাদের প্লেন গোসা করে আছে। অন্য কোম্পানিতে ব্যবস্থা করবে—কিন্তু বিষম ভিড়, জায়গা হচ্ছে না। নিজের খদ্দের সামলে তবে তো পরের লোক ঠাঁই দেবে!

কি করা যায়! শহরময় ঘুরে বেড়াই। ফেরি-জাহাজের বন্দোবস্তটা চমৎকার—অকারণে খাঁড়ির এপার-ওপার করি। আর সকাল-বিকাল এয়ার-অফিসে হানা দিইঃ খবর বলুন মশায়। আর কতদিন ভোগাবেন? গোঁফওয়ালা অতিরিক্ত রকম সাদা একজনের সঙ্গে মুখচেনা হয়ে গেছে। গোঁফের আড়ালে মুচকি মুচকি হেসে সে বলে, ব্যস্ত কেন? দেরি হচ্ছে, ভালই তো। বন্দরে

এসে কেউ তো নড়তে চায় না। আমোদ-স্ফূর্তির ভালো ভালো ঠিকানা আছে। খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি ?

আরে ভাই, খুঁজে বের করতে হবে কেন ? সে এমন জায়গা, স্ফূর্তি আপনি এসে তেড়ে ধরে। দিন-দুপুরে অথবা খোলামেলা রাজপথ বলে পরোয়া নেই। আসুন—শুনে যান একটা কথা। শুনতে পাচ্ছেন না, ও আপনি কোন্ দেশের মানুষ ?

একদিন কি বিপদে পড়লাম, বলি আপনাদের। সঙ্গীরা টহল দিতে বেরিয়েছেন—সকাল থেকে শরীরটা ভাল ঠেকছে না, আমি যাই নি তাঁদের সঙ্গে। চুপচাপ জানলায় বসে আছি। একটা জাহাজ নোঙর করে আছে কূল থেকে খানিকটা দূরে—চোঙের মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে। কিন্তু কাঁহাতক ভাল লাগে বসে বসে ধোঁয়া দেখা ? উঠে পড়লাম। এত বেলায় যাই-ই বা কোথা! লাউঞ্জ প্রায় খালি—এখানে একটি ওখানে একটি, জন পাঁচ-সাত হবে মোটমাট। এক বাটি চা নিয়ে কোণের এক ফাঁকা টেবিলে বসে পড়লাম।

অকস্মাৎ তুমল আক্রমণ। মেয়েটা কোন্ দিক দিয়ে যেন উড়ে এসে আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। চীনা মেয়ে, নাক চাপা। অনাচারে কালি পড়েছে চোখের কোণে। তবে বয়সটা কাঁচা, আর দেখতেও খারাপ নয়। আরও ভাল দেখাত, ভাল দেখাবার জন্য মুখে রঙ লেপে এবং রঙচঙে পোশাক পরে অতিরিক্ত রকম সাজগোজ যদি না করত। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম তার দিক থেকে।

এইটুকুতে উঠে পড়বে, তেমন পাত্র এরা নয়। তা হলে ব্যবসা করতে হত না। যেন মস্ত এক রসিকতা করলাম, এমনিভাবে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, শুনছেন ? আমি একটু চা খাব—

বলার সুরটা ভারি মিষ্টি। ইংরেজি বলছেও খাসা। সেই জন্যই বোধহয় অবহেলার ভাব কিছু কাটল।

বেশ তো, খাও—

জবাব দিয়ে বসেছি, আর তখন রক্ষে আছে! ঘাড় দুলিয়ে আবদারের ভঙ্গিতে বলে, শুধু চা নয় কিন্তু। খিদে পেয়েছে, আর কিছু চাই ঐ সঙ্গে।

নিরুৎসুক কণ্ঠে বলি, যা তোমার পছন্দ চেয়ে দেখতে পার। থাকলে ঠিক দিয়ে দেবে।

এবারে সোজাসুজি বলল, দামটা তুমি দেবে। তুমিই অর্ডার দাও। যা খাওয়াবে, তাই খাব আমি।

গতিক দেখে গা জ্বলে যায়। চীন ঘুরে আসছি, এদেরই স্বজাতি কত মেয়ে দেখে এলাম। জ্বলজ্বলে-মুখ লি-কুই-হুয়ার কথা ভাবছি। নাচের আসরে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এক পাক নাচবে বলে। তখন বুঝি কি-একটু আলোচনায় মগ্ন ছিলাম, অতশত ঠাহর করতে পারি নি। ঠাহর হল লি যখন ফর-ফর করে বেরিয়ে যাচ্ছে। শোন গো, শুনে যাও---কি যেন নাচের কথা হচ্ছিল?

উঁহু, মাথা ধরেছে আমার। নাচব না।

অভিমানী সেই সব মেয়েরা, আর এই! একই দেশের মাঝখান দিয়ে সরু খাল। তারই এপার-ওপারে আকাশ আর পাতালের ব্যবধান।

বয়কে ডেকে অর্ডার দিয়ে দাও না---

আমার হয়ে গেছে, উঠছি। দুঃখিত, তোমার সঙ্গে একত্র খাওয়ার সুখলাভ করতে পারলাম না।

সেই দিন বিকালবেলা ঘুরতে ঘুরতে এক তাজ্জব জায়গায় গিয়ে পড়েছি। বাঁধানো পোস্তা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে খাঁড়ির

জলে। মোটরলঞ্চ বিস্তর—ভাড়ায় ছুটোছুটি করছে। জল-ভ্রমণে বেরুবেন তো নিয়ে নিন ওর একটা। ভাড়াও এমন কিছু নয়—ঘণ্টায় দশ ডলার, হংকং-ডলার অর্থাৎ ন' টাকারও কমে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাচ্ছেও দলে দলে। একলা যেতে মন খুঁত-খুঁত করে তো সঙ্গিনী বেছে নিন। কত চাই, ঘাটের বাঁ-দিকটায় গাদাগাদি হয়ে আছে। কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। হাসি-মস্করা চলছে নিজেদের মধ্যে, এক-একটা কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। শিকারের দিকে নজর কিন্তু ষোল-আনার উপর আঠারো-আনা। চোখাচোখি হলেই হল, অমনি হাসতে হাসতে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াবে। তারপর উঠুন গিয়ে লঞ্চে, চলে যান অকূলের পানে। তরঙ্গে হাবুডুবু খান।

জায়গাটা কিন্তু সত্যি মনোরম। বসবার চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো বসতে পারছেন না। চেনা লোকে দেখতে পেলে মুখ টিপে হাসবে। চুপচাপ বসে বসে নিরামিষ জল-শোভা অবলোকন করছেন, তামা-তুলসী ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। চলে যাবার জন্য অতএব পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ভ্রমণ সেরে একটা লঞ্চ ঘাটে ভিড়ল। এবং তড়াক করে লাফিয়ে নামল সেই মেয়েটা। থোপা-থোপা চুল কপাল ঘিরে পড়েছে, চোখ-মুখ অবিকল সেই—নির্ঘাৎ হোটেলের সেইটি। পিছু পিছু নামল প্রকাণ্ডকায় মাঝবয়সি একজন। মিলিটারি মানুষ, চেহারাতেই মালুম। বাগিয়েছে আচ্ছা বটে, অমন হিমালয় সম মানুষটার 'সখি আমায় ধরো ধরো—' অবস্থা। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, জল বেধে আছে এখানে-ওখানে। মেয়েটার জুতোর তলায় এক ফোঁটা জল না লাগে—সেজন্য কখনো হাত ধরে কখনো বা কোমর ধরে কত কি কায়দা করছে, সে এক দেখবার বস্তু। দেখে তো আপনাদের হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বার কথা। অথচ

সেই হাসি চেপে-চুপে ঠোঁটের মধ্যে আটকে রাখতে হবে। যেহেতু নাম-করা জায়গা, দুনিয়ার এক সেরা বন্দর—যা-কিছু ঘটছে, সমস্ত সভ্য জগতের রীতিসঙ্গত।

সমুদ্র-বিহারের পর ডাঙায় উঠে আবার কোন নতুন স্ফূর্তিতে যাবে। ট্যাক্সি-রিক্সা অগুন্তি। ট্যাক্সিগুলো ভারি বনেদি এখানকার। খাস বিলাতি ড্রাইভার—পোশাক দেখে মনে হবে, শাপভ্রষ্ট কোন লাটবেলাট অনুগ্রহ করে স্টিয়ারিং-চাকায় হাত দিয়ে বসেছেন।

ট্যাক্সির কাছে যেতে মেয়েটা কিন্তু না না—করে উঠল: রিক্সায় যাই চলো—

দেরি হয়ে যাবে যে!

তা হোক, তা হোক, অনেকক্ষণ ধরে বেশ গায়ে-গায়ে বসে যাওয়া যাবে।

এ হেন গায়ে গড়ানোর প্রস্তাবেও কিন্তু লোকটার বেজার মুখ বিশেষ প্রসন্ন হল না। খরচের মেজাজ এখন। আদুল-গা, তালি-মারা হাফপ্যাণ্ট পরনে, একবেলা-খাওয়া চীনা-মূর্তি ধুঁকতে ধুঁকতে রিক্সা টানছে, চোখের সামনে এখন উৎকট লাগবে। মেয়েটা এ সমস্ত আমলে আনে না, হাত ধরে একটা রিক্সার কাছে নিয়ে এসে খিল্‌খিল করে হেসে বলে, উঠে পড় গো—

মনোভাব যা-ই হোক, হেসে হেসে হাত ধরেছে—সে হাত ছাড়িয়ে নেওয়া চলে না। চলল দু-জনে। কোন্ চুলোয় চলল, সঠিক জানিনে। আন্দাজে যা-হোক ধরে নিন।

চলে গেছে, মেয়েটার হাসির ধ্বনি তবু মনে পড়ছে। হাসি নয়, গরম সীসা ঢেলে দিচ্ছে কানের মধ্যে। লি-কুই-হুয়াকে ভাবছি। বাংলা 'দাদা' কথাটা বিস্তর কষ্টে সে শিখে নিয়েছিল, তাই বলে ডাকত। সাংহাই শহরে এখনো দু-পাঁচটা সাদা সাহেব

বিচরণ করে। ঐ যার গললগ্ন হয়ে মেয়েটা চলে গেল, হয়তো বা তারই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ফ্রেঞ্চ-টাউনের ভিতর এক সাহেবের দিকে আঙুল দেখিয়ে লি একদিন বলল, ওদেরই পাড়া ছিল এই সেদিন অবধি। নোটিস টাঙানো ছিল দাদা, চীনা আর কুকুরের প্রবেশ নিষেধ। কুকুর আর চীনা দুটো জন্তু এখানে বরদাস্ত করবে না।

কলিযুগে চোখের আগুনে কিছু পোড়ে না। সাহেবটার তাই কিছু হল না, বহাল তবিয়তে চলে যেতে পারল। কিন্তু সাংহাই অনেক দূর। লি'র কথা কেন ভাবছি এই মেয়েটার সঙ্গে? নাক থ্যাবড়া—ঐ যা একটু মিল। আর কিছু নয়।

সেই রাত্রে ডিনারে বসেছি। গটমট করে মিলিটারি লোকটা ঢুকল এবং আগে ঠাহর করি নি—এত রাত অবধি মেয়েটাও লেপটে আছে জোঁকের মতন। অদূরে এক ছোট টেবিল নিয়ে তারা বসল। আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। সাহেবের মেজাজ এখনো দিলদরিয়া সেই বিকালের মতো। খানার অর্ডার নিতে এলো, তা বাছা বাছা পদ একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে। মেয়েটার দেখছি কপাল খুলে গেছে। সহজে ছাড়ছে না লোকটাকে—হাড় খাবে, মাংস খাবে, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

রুটি দিয়ে গেছে, সুপ এসে পৌঁছয় নি। মেয়েটা গোগ্রাসে ঐ রুটি গিলে চলেছে। কী ক্ষিধে পেয়েছে—দেখে কষ্টও হয়। হেন কালে নিচের গেটম্যান এসে বলল, রিক্সাওয়ালা ভাড়া চাচ্ছে।

রুক্ষস্বরে লোকটা বলে, দিয়ে এসেছি তো!

তবু তো দাঁড়িয়ে রয়েছে, নড়ছে না।

মেয়েটা বলল, দিয়েছ দুই ডলার। ঘণ্টায় দু-ডলার রেট। আমাদের তো আড়াই-তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। পাঁচ ডলার পাবে অন্তত।

কে বলে আড়াই ঘণ্টা? কুল্যে এক—তা-ও বোধহয় পোরে নি। দুই ডলার তো খুশিতে বেশি দিয়ে এসেছি।

ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে লাগল। মেয়েটা অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, এত খরচ করলে, সামান্য ভাড়ার পয়সা নিয়ে অমন করে না। গরিব মানুষ—।

গরিব তা মানি, কিন্তু মানুষ বলছ কি করে? পাঁচ-পাঁচটা ডলার একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেছে কুত্তার বাচ্চাগুলো?

আধেক-খাওয়া রুটির টুকরো ফেলে দিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। মুখে ছাই মেড়ে দিয়েছে। মিলিটারি হাঁদারামের খেয়াল হল এতক্ষণে, যার সঙ্গে আমোদ-স্ফূর্তি করছে সেটিও তো ঐ জাতের। বেকুব হয়ে বলে, হল কি?

আমি চললাম—

খিধে পেয়েছে বললে যে! তোমার জন্যেই তো হোটেলে আসা।

না, খেতে পারব না আমি তোমার সঙ্গে। তোমার পয়সার খাবার গলায় ঢুকবে না।

বলতে বলতে—অবাক কাণ্ড, কেঁদে ফেলল সহসা। টপ-টপ করে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল পালিশ-করা মুখের উপরে। মাটি তুলে যেমন খাল বানায়, তেমনিধারা হয়ে গেল দু-গালের উপর। কী বিশ্রী, কী বিশ্রী! এমনি করে রূপ-যৌবন রচে এরা। সে রূপ এত পলকা, দু-ফোঁটা জলের ভর সয় না।

তা হোক, আমার কিন্তু কি রকমটা হয়ে গেল। এক অপকর্ম করে বসলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অতি সম্ভ্রমে মেয়েটিকে ডাকলাম, আমার টেবিলে আসুন অনুগ্রহ করে। বড় আনন্দ পাবো।

বিদেশ-বিভূঁই এবং বন্দর জায়গা বলেই পারলাম বসতে ঐ শ্রেণীর মেয়েকে টেবিলে নিয়ে। দেশে হলে আপনারা আস্ত রাখতেন ?

(১০)

মধ্য-এশিয়ার আকাশে আকাশে ঘুরছি সে সময়টা। মরু আর স্তেপভূমি—উট-ঘোড়া-খচ্চর ছাড়া চলাচলের কোন উপায় ছিল না তিরিশটা বছর আগেও। উটের ক্যারাভান সাজিয়ে ব্যাপার-বাণিজ্য। মাঠের মাঝে রাত্রিবেলা তাঁবু খাটিয়েছে—খানাপিনা গান আর তম্বুরিনের বাজনা—খটাখট খটাখট দিগন্তে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে দস্যু যাযাবরের দল এসে পড়ল। নিঃসীম আকাশ ব্যেপে অসহায় আর্তনাদ। রক্তস্রোত আর মৃতদেহ পড়ে রইল শূন্য তাঁবুতে। সেদিন অবধি এই অবস্থা। এখন উড়তে উড়তে দেখবেন—ফ্যাক্টরির চোঙা, সবুজ ফসল। খাল কেটে কেটে জলধারা উষর মরুতে টেনে নিয়ে এসেছে। যেখানে নামি, প্রসন্ন মানুষ হাসতে হাসতে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে।

পৃথিবীর ছাত পামির, তারই পায়ের গোড়ায় নতুন এক শহর। এইখানে আছি ক'দিন। সন্ধ্যা হব-হব, পপলারের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। ছোট দুয়োর-জানলা নিচু-ছাত দু-চারটে সেকেলে বাড়ি, তারই মাঝে মাঝে একালের কংক্রিটের ইমারৎ উঠছে। আজ রাত্রে চলে যাব, শেষ দেখা দেখতে বেরুচ্ছি সকলে। মোটর দাঁড়িয়ে সারবন্দি।

দাঁড়ান দাঁড়ান—আমি যাব না বুঝি ?

দলের এক তরুণী মেয়ে। আক্রোশ অধমেরই উপর। দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে বসে পড়লেন গা ঘেঁষে। হাতে সর্বক্ষণের এক লাল

বটুয়া। সযত্নে সেটা কোলের উপর নিয়ে নড়েচড়ে গ্যাঁট হয়ে বসলেন।

খাঁটি নাম বলব না। ধরে নিন কৃষ্ণা দেবী। কৃষ্ণা নামে আরও অবশ্যই চটে যাবেন তিনি, সুবর্ণা বা জ্যোৎস্না বললে পছন্দসই হত। সেই চেষ্টাই করেন অহরহ। ঐ যে লাল বটুয়া দেখছেন, ওর মধ্যে বিবিধ চূর্ণ ও প্রলেপের কৌটো। আমাদের গাঁয়ের জানকী কবিরাজ পোঁটলায় করে ঠিক এমনি মলম-মালিশ বয়ে বয়ে বেড়ান। বিদেশে এত ঘোরাঘুরির মধ্যে কৃষ্ণা দেবী একটু ফাঁক পেয়েছেন কি বসে গেলেন নিজ দেহে রং-মেরামতের কর্মে।

আমার দিকে মহিলার কিঞ্চিৎ অধিক নেকনজর। আজ্ঞে না, গোলমেলে কিছু ভাববেন না। কৃষ্ণাননের উপর তিনি সাদা পাফ বুলোন; আমার ঠিক উল্টো ব্যাপার—সাদা কাগজের উপর কালির দাগা বুলোই। দু-চোখে যা দেখি, টুকে আনতে চাই আপনাদের জন্যে। পাশে বসে দায় চুকল না, কৃষ্ণা দেবী ঘাড় বেঁকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখেন।

লিখছেন এখন? কি লিখলেন, পড়ুন না। ইংরেজি করতে হবে না, বাংলাতেই বলুন। বাংলাও বুঝতে পারি আমি।

একদিন একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বসলেন, আপনার বইয়ে থাকব তো আমি? দেখবেন, বাদ পড়ে না যাই।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে রাজা ব্রুস বইয়ে চিরজীবী হয়ে থাকতে পারেন, কৃষ্ণা দেবীই বা কোন দোষ করলেন? সারা জীবনে ব্রুস সাতবার মাত্র লড়াইয়ে হেরেছিলেন, আর ইনি দেখতে পাচ্ছি দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টায় বার চব্বিশেক অন্তত হারছেন। তবু দমেন না। আরে মশায়, ঈশ্বর মেরে রেখেছেন, মানুষের রুখবার তাগত কি? সিকি ইঞ্চি বোধ করি পাউডার-ক্রিমের

প্রলেপ পড়ে গেছে দেহচর্মের উপর, তবু তারও ভিতর থেকে কালো রং কট-কট করে ফুঁড়ে বেরোয়। একদিন এক কাণ্ড হল, তাইতে আরও বেশি করে জানলাম। চোখ করকর করছে, জল ঝরছে বিষম। কী হয়েছে? চিলের মতন কৃষ্ণা উড়ে এসে পড়লেন: দেখি, দেখি—ইস্, চোখ ডলে ডলে লাল করে ফেলেছেন, তাকান দিকি আমার দিকে ভাল করে।

নিরিখ করে দেখে বললেন, পোকা ঢুকছে চোখের ভিতর, কোণের দিকে লেপটে আছে, ফুঃ-ফুঃ-ফুঃ—।

পোকা বের করবার চেষ্টায় আমার অবস্থা আরও মারাত্মক হল। যত তিনি ফু দিচ্ছেন, মুখের পাউডার ফুর-ফুর করে এসে পড়ছে। কেয়াফুল ফোটে বর্ষাকালে, সেই ফুটন্ত কেয়া আপনার গায়ে আছড়ালে যেমন রেণুতে রেণুতে ঢেকে যায়, অবিকল তাই। পোকা বেরিয়ে গেলেই বা কি, কৃষ্ণার মুখের পাউডারেই দুটো চোখ অন্ধ হবার সামিল। সেই তখন ভদ্রমহিলার অধ্যবসায়ের খানিকটা পরিমাপ পাওয়া গেল।

যাকগে, গুণের ব্যাখ্যান থাকুক এখন, সেই গুণময়ীকে পাশে নিয়েই তো চলেছি। পাশে বসে একমনে তিনি নিজ কর্মে ব্যস্ত, বাইরে তাকানোর ফুরসত নেই। ছোট্ট একটু আয়না ধরে বিম্বাধরে লিপস্টিক বুলোচ্ছেন। মিউজিয়ামে এসে মোটর থামল, তখনও কাজ চলছে। চোখ না তুলে নাকিসুরে বলেন, ফেলে যাবেন না—দাঁড়ান।

এইসব তল্লাটে অন্তত একটা কারণে বেড়াতে আসবেন—কার্পেটের কাজ দেখবার জন্য। চার হাত বাই তিন হাত জায়গার মধ্যে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সমেত গোটা শহর। সমস্ত হাতের বুনানি, তাজ্জব হতে হয় কিনা বলুন।

ঘুরতে ঘুরতে সময়ের খেয়াল ছিল না। ঘড়ি দেখে চমকে উঠি। যদ্দূর হয়েছে, আর নয়। এ-জন্মের মতো এই শেষ। কিন্তু কমলি

নেহি ছোড়েগা—ফিরতি মুখেও কৃষ্ণা দেবী যথারীতি পাশে আমার। সহসা আপ্যায়িত করে উঠলেন : দোকান ঘুরে চলুন একটু, গোটা ছুই জিনিস কিনব।

কি জিনিস, বুঝেছেন তো? আর মেয়েলোকের পছন্দের ব্যাপার—ছু-এক মিনিটে হবার নয়। ক্ষমতা থাকলে না-না করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতাম। কিন্তু মোটরগাড়ি আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়—আমাদের তিন-চার জনের জন্য দিয়েছে এক-একটা গাড়ি। আমি অনিচ্ছা দেখালে উনিই সোজাসুজি হুকুম করবেন ড্রাইভারকে। এখন তো মরীয়া। অন্ন বিহনে তবু এঁদের চলে, কিন্তু বটুয়া খালি হয়ে গেলে মাথায় বজ্রপতন হয়।

অবশেষে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, দলের আর সবাই এক সঙ্গে রে-রে করে উঠল : এত শিগগির কেন, আর দশ মিনিট পরে এলেই তো হত! আমরা চলে যেতাম, রাজত্ব করতে এখানে একা একা।

তাতে অবশ্য এমন-কিছু অসুবিধা ছিল না। আপনারা বিরিয়ানি খেয়ে থাকেন, তারই আদিস্থান। হিমালয় পেরিয়ে নানান অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শেষটা বাংলা মুলুকে পৌছেছে। সাত নকলে আসল খাস্ত—আসলের স্বাদ কোথায় পাবেন আপনারা? সেইসব বাদশাহি খাদ্য খেয়ে খেয়ে মশগুল হয়ে আছি। ভুলই করেছি সত্যি। দশ মিনিট আগে যদি পৌছতাম, আর এক দফা বিরিয়ানি ঠেসে রওনা হওয়া যেত। দশটা মিনিট পরে এলে রাজত্বের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ত অন্তত পক্ষে। কিন্তু গেরো খারাপ, ভূঁয়ে পা দিতে না দিতেই বলে, উঠুন—উঠে পড়ুন আবার, সময় নেই।

খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাক, ঘরে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসব, তার ফুরসত দেয় না।

হুশ করে এক দৌড়ে এরোড্রোমে এনে ফেলল। প্লেনের ভিতরটা লম্বা এক বাক্স। সেই বাক্সে ঢুকে দুয়োর এঁটে দিয়ে চক্ষের পলকে আকাশে উঠে পড়লাম। পেটের মধ্যে আলোড়ন উঠেছে। তবে এই এক ভরসা, প্লেনের ভিতর আয়োজন থাকে, আর কিছু না হোক, স্যাণ্ডউইচ ও আঙুর-আপেল যাচ্ছে কোথা?

তারপরে, ও হরি, সুস্থির হয়ে বসে যাবতীয় খবরবাদ নিয়ে দেখি, হোস্টেসের ভাঁড়ে মা ভবানী। দু-এক কাপ চা-কফি হতে পারে বড় জোর। রাতের খাওয়া সমাধা করে সকলে এসেছেন, এখন শুধু আলো নিভিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়বার কথা। সকালবেলা নামব কাজাকিস্তানের এক শহরের কিনারে। প্রাতরাশ সেখানে। প্লেনে অকারণে খাদ্য আনেন নি তাই এঁরা। সকলের দেখাদেখি আমিও কম্বল মুড়ি দিলাম। কৃষ্ণা দেবী পিছন দিকে, তিন-চার সারির ব্যবধানে। পাছে পাশের জায়গা দখল করেন, আমিই তাই আগেভাগে গোঁফদাড়ি ও লোহার বালা সমন্বিত সুজন সিংয়ের পাশ জুড়ে বসেছি।

কিন্তু ঘুম জমে কই?···জামবাটি ভরতি করে মা মুগের অঙ্কুর ভিজে-ছোলা ও আখের চিনি দিয়েছেন, গবাগব মুখগহ্বরে চালান করছি···এমনি সব মনোরম স্বপ্ন। স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে জেগে উঠছি। সব আরোহীই ঘুমে অচেতন। আলো নিভিয়ে দিয়েছে, এয়ার-হোস্টেসের ডান পাশে শুধু একটা কম-জোরি আলো জোনাকির মতন। বই পড়ছে সে একমনে। ঘুমন্ত নভোলোকের একটিমাত্র পাহারাদার ঐ মেয়েটি। আর জেগে আছে পাইলট ও অফিসারেরা। ককপিটের মধ্যে তারা, দেখতে পাচ্ছিনে। মেশিন চালিয়ে দিয়ে তারাও ঢুলছে কিংবা কি করছে, কেবা জানে?

তারপরে এক সময় আর কিছু জানিনে। অনেক নিচে মৃত্তিকার দেশে আরল সাগর ঢেউয়ের বাহু ছুঁড়ছে, বোখারা-সমরখন্দ দীপ

দেখাচ্ছে—কিছু জানিনে একেবারে। অনেকক্ষণ কেটেছে, আবার একটু যেন সাড় হল। স্বপ্ন দেখছি, এবারে ভোজন নয়—বয়সে ছোট্ট হয়ে গিয়ে নাগরদোলায় দুলছি। নীলপূজোর মেলায় ভদ্রার তীরে বাঁশতলা সাফ-সাফাই করে নাগরদোলা বসিয়েছে, মোক্ষম পাক খাচ্ছি নাগরদোলায় চড়ে যেন। ঘুম ভেঙে চোখ মেললাম। সত্যি তো, কী বিষম দোলানি! হু-হু করে প্লেন নামছে। জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি, কুয়াশায় আকাশ-ভুবন মুছে গিয়েছে। সকাল সাতটায় তো আমাদের নামবার কথা। ঘড়ি দেখলাম, সোয়া-তিনটে। তবে? যা ভেবেছিলাম হয়তো বা তাই, ঘুমের ঘোরে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসেছে। কী করা যায়, ডেকে তুলব নাকি সকলকে? ও মশায়রা, আরামসে নাসাগর্জন করছেন, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত এদিকে। পাকা আমের মতো প্লেন ভুঁয়ে পড়ছে। পরমায়ু মিনিট পাঁচেক বড় জোর—তারপর হাড়ে মাসে সবসুদ্ধ তালগোল হয়ে আছি।

চেঁচাবার ইচ্ছে, কিন্তু ঘুম জড়িয়ে আছে, গলা খোলে না। ঘস্‌স্‌ করে আওয়াজ হেনকালে, ভূমির গায়ে প্লেন লাগবার সময় যেমনটা হয়। প্লেন অতএব পড়ে যায় নি, ধীরেসুস্থে নামিয়ে এনেছে।

জানলা দিয়ে প্রাণপণে নজর হানি। অন্ধকারে যতদূর ঠাহর হয়, দিক্‌হীন তেপান্তরের মাঠ। সারবন্দি আলো দেখা যায় মাঠের প্রান্তে। এ কোথায় নিয়ে এল, কথা ছিল না এমন তো! থমথমে রাত্রিবেলা প্লেন দৌড়তে দৌড়তে সেই আলোর সারির ভিতর এসে পড়ল। দৌড়চ্ছে—আর দেখলাম, যে-আলো পার হয়েছি, সেগুলো নিভছে সঙ্গে সঙ্গে; সামনের দিকে নতুন আলোর সারি জ্বলে উঠছে।

থামল প্লেন অবশেষে। থেমে দাঁড়িয়ে গর্জাচ্ছে। দরজা খুলে

দিল : নামুন, নেমে পড়ুন। মালপত্র যেমন আছে থাক, মানুষগুলি নেমে যান শুধু।

সিঁড়ির নিচে লণ্ঠন ধরে এয়ার-অফিসার কয়েকজন। হ্যারিকেন নয়, ঐ জাতীয় অন্য ধরনের কেরোসিনের বাতি।

হুড়মুড় করে নামছে সকলে। আমার জো আছে? সিটের উপর বটুয়া ফেলে কৃষ্ণা দেবী বাঁ হাত বাড়িয়ে ওভারকোটের কলার ধরে ফেললেন : আমি একলা পড়ে রইব বুঝি?

কথা শুনুন একবার, স্বদেশ থেকে আমি যেন ওঁর রক্ষী হবার চুক্তিপত্র লিখে দিয়ে রওনা হয়েছি! বলছেন আর শশব্যস্তে পাউডার বুলানো শেষ করছেন। রাত্রিবেলা অজানা অন্ধকার মাঠে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কারা ওঁর রূপ দেখবার জন্য চোখ মেলে বসে রয়েছে, তা তো জানিনে।

সর্বশেষ আমরা দু-জন। এবং লণ্ঠনধারী ওদের একটি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়াতে সর্বশরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। কী শীত, কী শীত! কনকনে হাওয়া বইছে। অনেক দূরে—দু-ফার্লং তো হবেই—একটা জোরালো আলো দেখা যাচ্ছে। প্যাচপেচে কাদা, বরফ গলে জল জমে আছে এখানে-ওখানে। তারই মধ্যে জুতো ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছি। মোজা ভিজে গেছে। শীত ঐ ভিজে মোজা দিয়ে পা বেয়ে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনিয়ে ব্রহ্মতালু অবধি গিয়ে পৌঁছচ্ছে। যাচ্ছি কোথায় গো? দোভাষিরা এগিয়ে গেছে। লণ্ঠনধারী এ-লোক ইংরেজি জানে না, জিজ্ঞাসা করলে হাসে শুধু ফিকফিক করে।

অবশেষে পৌঁছানো গেল আলোর ধারে। হ্যাজাক জাতীয় কেরোসিনের আলো। প্লেন নামবার সময় সারবন্দি যে ডায়নামোর আলো জ্বলছিল সে-সমস্ত নিভে গেছে এখন। নিঃসীম মাঠ অন্ধকারে হাড়-কাঁপানো শীতে থমথম করছে। তার মাঝখানে খান

চার-পাঁচ ঘর নিয়ে এতটুকু এই অফিস। কত গল্প শুনেছেন মধ্য-এশিয়ার এই সব স্তেপ-অঞ্চলের। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেই জায়গায় এখন আমরা। লড়াইয়ের সময় হাসপাতাল বানিয়েছিল এই মাঠের মধ্যে, এয়ার-ফিল্ড বানিয়েছিল কাজ-চালানো গোছের। হাসপাতাল চালু নেই, এয়ার-ফিল্ড রেখেছে দায়ে-বেদায়ে যদি কাজে আসে। এই আজকে যেমন। সমস্ত শোনা গেল এর্বার। অত কুয়াশার মধ্যে উড়তে ভরসা করল না—শ-দেড়েক মাইল ঘুরে এখানে এনে নামিয়ে দিল বাকি রাতটুকু লেপ-কম্বলের নিচে আরামে ঘুমুবেন বলে। অদূরে হাসপাতাল-বাড়িতে পঞ্চাশটা বিছানা পেতে রেখেছে। তিরিশ জন মানুষ, গড়ে দেড়টা করে শয্যা নিয়ে গড়িয়ে পড়ুন গে।

কিন্তু খালি পেটে ঘুম হবে না তো, তার কি বন্দোবস্ত? আর সকলে ভরপেট হয়ে এসেছেন, বাকি দু-জন মাত্র। আমি, আর ঐ যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দোভাষি চুক-চুক করে: দৈবাৎ এসে পড়া এখানে। এয়ার-ফিল্ডের লোকজন সব চলে গেছে। সকালবেলার আগে তো উপায় দেখছিনে।

সহসা যেন ঐশীপ্রেরিত বাণী কানে এল: দেখা যাক, আমি কি করতে পারি। দু-চারটে বিস্কুট আর এক কাপ কোকো হয়তো হবে।

বলছে, হাঁ, দেবকন্যাই বটে। ধবধবে রং, নাক-মুখ চোখা-চোখা, আর দশটা শ্লাভ মেয়ের মতো থ্যাবড়া গড়নের নয়।

দোভাষি হেসে বলে, ডাক্তার মানুষ—তা উনি পারতে পারেন। কিছু না হোক, রোগির পথ্যও তো আছে!

এমনিভাবে ফটকে দাঁড়ানোর গতিক দেখেই বুঝেছি—ডাক্তার। প্যাসেঞ্জার এসে ঢোকে, আর তাদের আপাদ-মস্তক সতৃষ্ণ চোখে

নিরীক্ষণ করে। অত উঁচু দিয়ে আসতে নিদেনপক্ষে মাথাঘোরাও হবে না কারো? এয়ার-অফিস যত ছোট হোক, ওষুধপত্র ডাক্তার ও একজন-তু'জন নার্স থাকবেই। নার্স-ডাক্তারের কাজ মেয়েদের প্রায় একচেটিয়া। রোগিরাও পছন্দ করে। রোগ দেখার জন্য একবার বা কপালে হাত রাখল, কোমল হাতে হাঁ করিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আলো ফেলতে লাগল মুখের ভিতর। রোগ না থাকলেও এ হেন ডাক্তারের রোগি হয়ে শুয়ে পড়তে মন হয় কিনা বলুন। তাড়াতাড়ি রোগ সারানো মুশকিল বরঞ্চ এমনি সব ডাক্তারের হাতে।

আর সকলে শুতে চলে গেলেন। ডাক্তার এক লহমা ভিতরে গিয়ে কোকোর বন্দোবস্ত করে এল। এসে কাছ ঘেঁষে বসল। বারবার তাকাচ্ছে আমার দিকে। এসে অবধি এই ব্যাপার লক্ষ্য করছি। দোভাষির সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, মুখ ফিরিয়ে দেখি, তাকিয়ে রয়েছে ডাক্তার একদৃষ্টে। চোখাচোখি হতে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। কী দেখছে এত করে? প্রেমে পড়বার সন্দেহ করিনে। সে-বয়স পার হয়ে গেছে—আর রূপে-রঙেও তো কন্দর্পের দোসর একেবারে! ডাক্তার মানুষ—কোনরকম শক্ত রোগের লক্ষণ পায় নি তো চেহারার মধ্যে?

হঠাৎ প্রশ্ন করল, সময় কত?

বললাম, ভারত থেকে আসছি। ম্যালেরিয়া কিছু বেশি আমাদের অঞ্চলটায়।

চালাক মেয়ে, একটু যেন লাল হয়ে উঠল। তা বলে কি হবে দেয়ালের গায়ে চোখের সামনে ঘড়ি—সময় জিজ্ঞাসার মানেই হল আলাপ-সালাপ জমানো। বলছি, তিরিশজন এসেছি এক দলে। তোমাদের দেশ দেখছি। বড় ভাল তোমরা, বড্ড আতিথেয়তা।

এত কথার পরে আর সঙ্কোচ থাকে না। উসখুস করছিল, বুঝতে পারছি; এবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলল, ভারতে এমনি সুন্দর বুঝি সকলে?

অবাক হয়ে তাকাই। কার কথা বলছে? আছি তো আমি আর কৃষ্ণা দেবী, বিধাতা উভয়কেই মেরে রেখেছেন। সেই বিধাতার সঙ্গে কৃষ্ণা দেবীর আড়াআড়ি—বিধিদত্ত রং একটুকু ফ্যাকাশে করবার চেষ্টায় দিবারাত্রি লেগে আছেন। আর আমি গোড়া থেকেই হাল ছেড়ে আছি। কাকে এর মধ্যে সুন্দর দেখল? মাথা নিশ্চয় খারাপ—অন্তত পক্ষে চোখ খারাপ ডাক্তার-মেয়েটার।

নিশ্বাস ফেলে বলছে, দেখ, এই জায়গার কাজটা ইচ্ছে করেই আমি নিয়েছি। গরম আবহাওয়া আর কড়া রোদে খানিকটা যদি জৌলুস খোলে। কিচ্ছু হয় না। ভারতে গিয়ে ঘুরে আসতে পারতাম যদি কিছুদিন, এই যেমন তোমরা এদেশে এসেছ—

কোকো-বিস্কুট এসে পড়ল। কৃষ্ণাও বসে পড়লেন টেবিলটার ওধারে। উজ্জ্বল আলোয় ডাক্তার একবার আমার দিকে একবার কৃষ্ণা দেবীর দিকে তাকায়। মৃদু স্বরে বলে, ভারতে একটা ব্যাপার দেখছি, মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি সুন্দর। অন্য সব দেশে একেবারে উল্টো। গরম দেশে মেয়েদের রং খোলতাই হয় না বুঝি?

যত আস্তে বলুক, কৃষ্ণা দেবীর কানে গেছে। মনে মনে গর্জাচ্ছিলেন, বিস্ফোরণ হল কোকো খেয়ে যখন শোবার বাড়ির দিকে চলেছি: আস্পর্ধা বোঝ। থ্যাবড়া মুখ, নাক-চোখ আছে কি নেই, রং একটু সাদা—সেই দেমাকে ফেটে পড়ছে। ঠাট্টা করল কী রকম আমাদের!

আমারও সেই অনুমান। ঠাট্টা ছাড়া অন্য কী হতে পারে? এয়ার-অফিসে আলোর নিচে সত্যি সত্যি আজ রূপ খুলেছিল

ঘষামাজা করে দিব্যি দাঁড় করিয়েছেন। রাত্রিবেলা
ধরা পড়ে না, ঐটেই যেন আদি রং ওঁর। আর আমার
ায় দেখলাম, আরো বেশি ঘন হয়েছে সারাদিনের ধকলে।
কৃষ্ণার চেয়ে আমায় বেশি তারিফ করল। ঠাট্টা ছাড়া
হতে পারে?

কৃষ্ণা বলছেন, আমাদের মেয়েদের জানেন না—বড্ড পাজি আমরা। অন্য মেয়ে আমরা দু-চোখে দেখতে পারিনে। মুখের উপরে তাই কুচ্ছো করল। এই অসভ্য দেশে মানুষ আসে! মুড়ো জ্বেলে দিতে হয় এমন জাতের মুখে।

সকালবেলা বিষম কাণ্ড। হুলস্থূল কৃষ্ণা দেবীকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে, বাথরুমের কাছে পা হড়কে গিয়ে একেবারে অজ্ঞান। সকলে বিব্রত। বিরক্তও বটে। না খেয়ে খেয়ে তন্বী হন, রক্ত কমে গিয়ে রূপের আভা খোলে। শরীরে পদার্থ থাকতে দিয়েছেন কি এঁরা কিছু? তা যা করবার ঘরে বসে করলেই কেউ কিছু বলতে যায় না, বিদেশ-বিভুঁয়ে বেরুনো কেন? একের জন্য সকলের অসুবিধা। বলছেও কেউ-কেউ, হাসপাতালে রেখে চলে যাই আমরা। আরাম হলে এরা পাঠিয়ে দেবে।

এ হেন ধাপধাড়া জায়গায় দৈবাৎ মওকা মিলল তো ডাক্তার আর দেরি করে! নার্স ও ওষুধপত্র সহ এসে পড়েছে। মাঠের মধ্যে রাজসূয় ব্যাপার জমিয়ে তুলল। আহা, কষ্ট হচ্ছে আজ কৃষ্ণা দেবীকে দেখে। মেজেয় পড়ে ছিলেন, ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিয়েছে। বিস্রস্ত চুলের বোঝা, মুদিত চোখ, চোখের নিচে কালিমা। সকালে প্রসাধনের সময় হয়ে ওঠে নি, অকৃত্রিম কটকটে রং বেরিয়ে পড়েছে। এতদিন এক সঙ্গে ঘুরে আমরাও কখনো এ বস্তুর আঁচ পাই নি। ছাতার কাপড় কি মাথার চুলের সঙ্গে

খানিকটা তুলনা চলে। ভাগ্যিস চেতনা নেই, এই চে
গতিকে আয়নায় দেখলে ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল

ডাক্তার ইনজেকশন দিল একটা। অভয় দিচ্ছেঃ
সামলে উঠবেন—ভাবনার কিছু নেই। আটটার মধ্যেই আপনা
প্লেন ছাড়তে পারবে।

বলছে, আর মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাচ্ছে কৃষ্ণা দেবীর দিকে। দেখে দেখে আশ মেটে না। আমার কাছে এসে বলে, কী চমৎকার কালো রং! ভুল বলেছিলাম, পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর তোমাদের মেয়েরা। রাতে কেরোসিনের আলোয় কেমন সাদা সাদা ঠেকছিল। আচ্ছা এমন মিশকালো রং কেমন করে হয় বলো দিকি—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে, একটু কালো হবার জন্য কী না করছি! ইচ্ছে করে এই মরুভূমি জায়গায় বদলি হয়ে আছি। ঠিক দুপুরবেলা রোদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। পুরো বছর ধরে এমনি চলছে। গায়ে শ্বেতকুষ্ঠ হয়েছে যেন, কোন রকম চিকিৎসা নেই। এত করছি, কিছুতে কিছু হয় না।

কান্নায় ভেঙে পড়ে ডাক্তার-মেয়েটি। কৃষ্ণা দেবী ওদিকে চোখ মেলেছেন। ইনজেকশনের ক্রিয়া হয়েছে অতএব। উঠে বসলেন। সোরগোল পড়ে গেল, রওনা হবার তবে আর বাধা নেই। লাল বটুয়া সেই থেকে মেজেয় পড়ে আছে, কৃষ্ণা দেবী ভ্রূক্ষেপও করলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন, মানুষগুলো এখানকার সত্যি ভাল, খাসা দেশ। আর কদ্দিন আছি আমরা বলুন তো? বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে ভাল করে দেখতে হবে কিন্তু।